জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

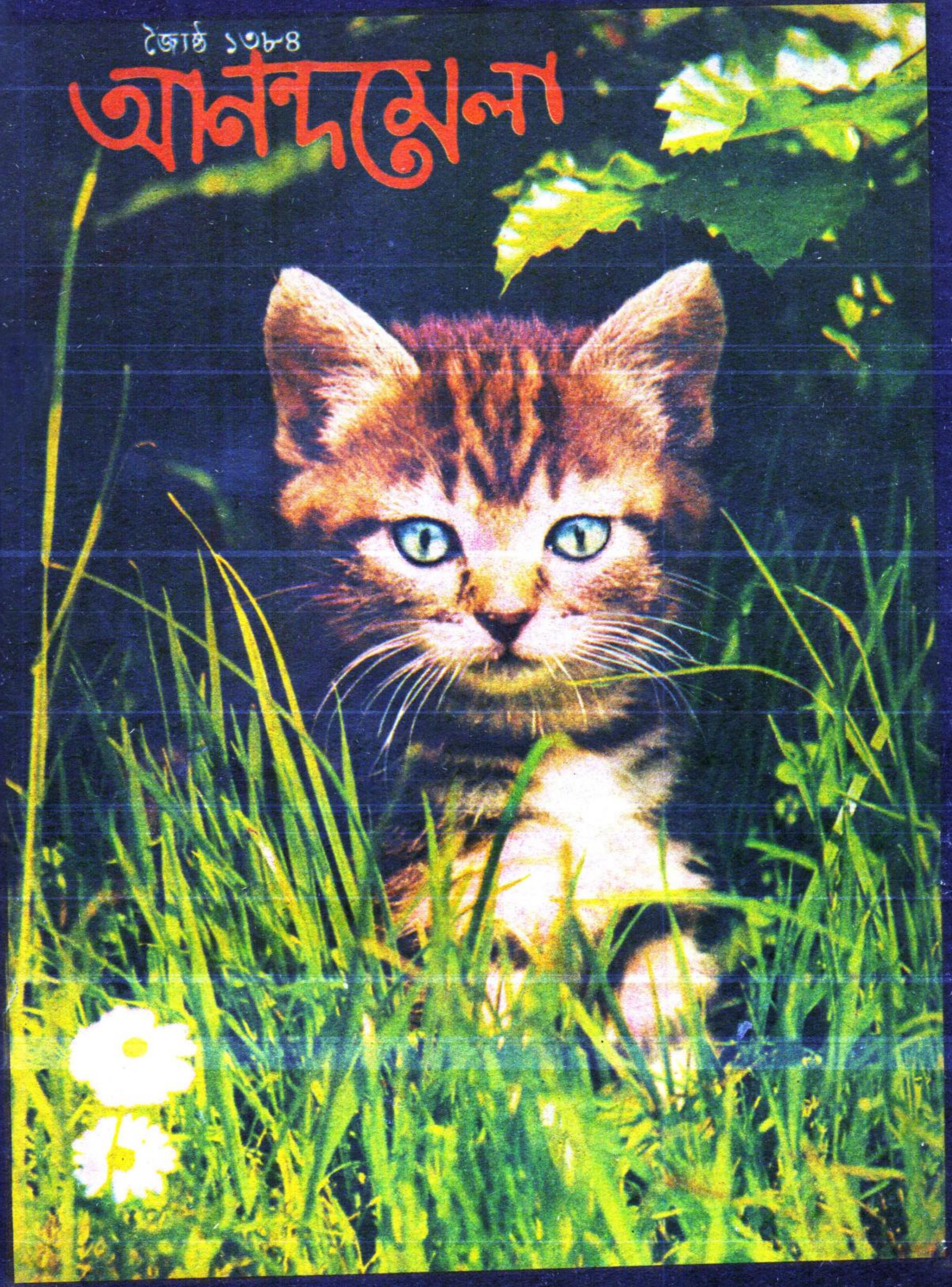

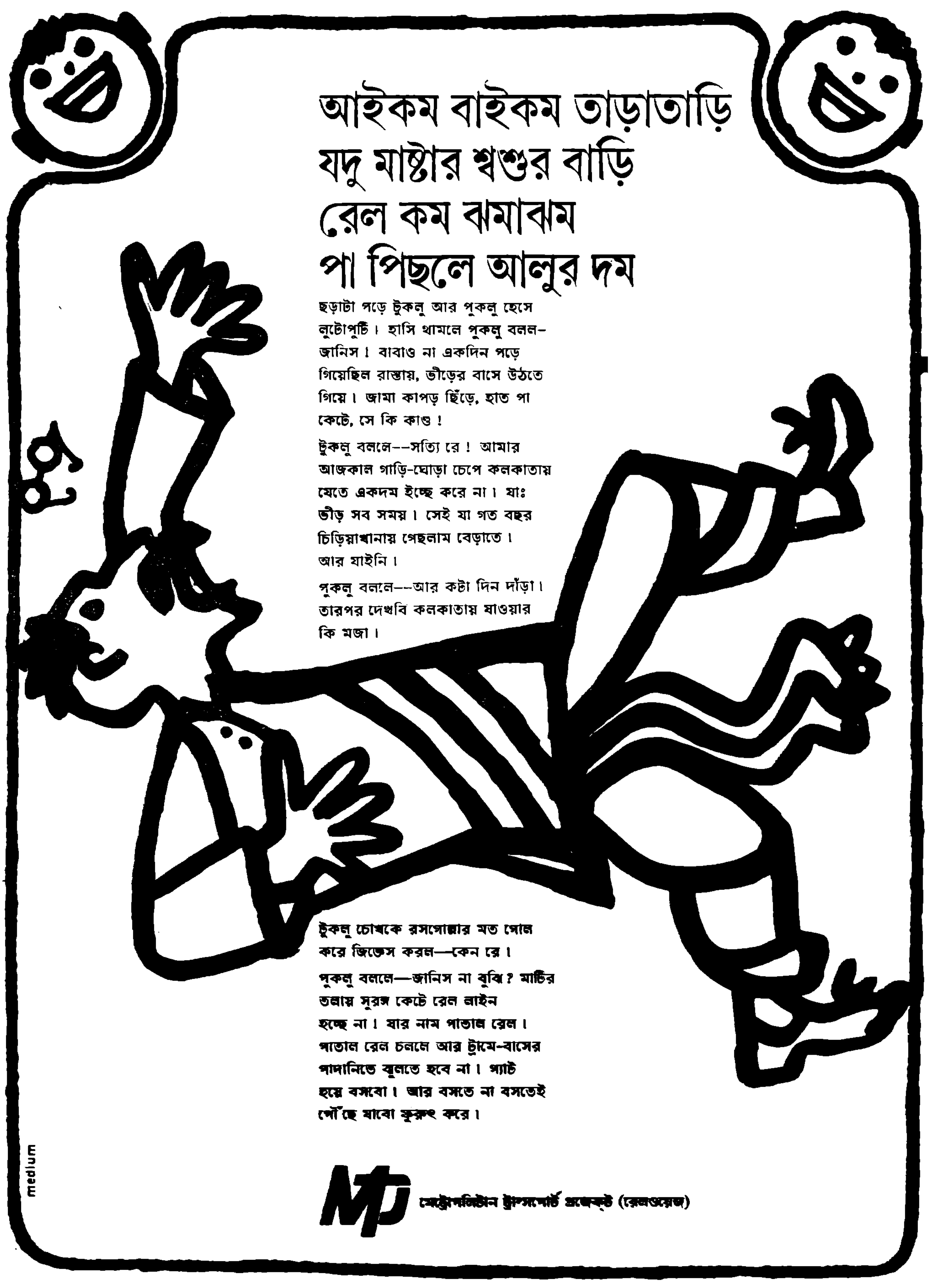
আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি
রেল কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম
ছড়াটা পড়ে টুকলু আর পুকলু হেসে লুটোপুটি। হাসি থামলে পুকলু বলল– জানিস! বাবাও না একদিন পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, ভীড়ের বাসে উঠতে গিয়ে। জামা কাপড় ছিঁড়ে, হাত পা কেটে, সে কি কাণ্ড!
টুকলু বললে––সত্যি রে! আমার আজকাল গাড়ি-ঘোড়া চেপে কলকাতায় যেতে একদম ইচ্ছে করে না। যাঃ ভীড় সব সময়। সেই যা গত বছর চিড়িয়াখানায় গেছলাম বেড়াতে। আর যাইনি।
পুকলু বললে––আর কটা দিন দাঁড়া। তারপর দেখবি কলকাতায় যাওয়ার কি মজা।
টুকলু চোখকে রসগোল্লার মত গোল করে জিজ্ঞেস করল—কেন রে।
পুকলু বললে—জানিস না বুঝি? মাটির তলায় সুরঙ্গ কেটে রেল লাইন হচ্ছে না। যার নাম পাতাল রেল। পাতাল রেল চললে আর ট্রামে-বাসের পাদানিতে ঝুলতে হবে না। প্যাট হয়ে বসবো। আর বসতে না বসতেই পৌঁছে যাবো ফুরুৎ করে।
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)
medium

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

গল্প অশরীরী। লীলা মজুমদার ৪
প্রব্যগুণে। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ১১
বাড়ির নীচে নদী। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২২

ছড়া মাথা নিয়ে মাথাব্যথা। অজিত দত্ত ৭
হাঁসের ছানা। গোপাল ভৌমিক ৫৪

উপন্যাস মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৪
সবুজ দ্বীপের রাজা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬

বিশেষ রচনা গুপিসির সঙ্গে একটি দুপুর। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯

কমিকস মেরু-রহস্য ৮, টিনটিন ৩০, গাবলু ৪৪

খেলাধুলো ফুটবল-লীগে কে কেমন খেলবে। পুষ্পেন সরকার ৪৭
মজার ক্রিকেট। দ্বাদশ ব্যক্তি ৪৯
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সুব্রত সরকার ৫০
কলকাতা থেকে বার্মিংহামে। চিরঞ্জীব ৫১

লেখাপড়া কমলা গার্লস স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৪২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৪০

ধাঁধা-মজা-রহস্য আটখানা। অসিত পাল ২৮
ধাঁধা আর ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা মজার পড়া ১০, তোমাদের পাতা ২১
আঁকো ৩২, শেখো ৩২, বানাও ৩৩
আগ্নেয়গিরি ৪৫, আচ্ছা বলো তো ৪৫
মণিমেলার খবর ৪৬, ডোডো-তাতাই ৪৬
ম্যাজিক ৫৪

'অশরীরী' ও 'দ্রব্যগুণে'-এর ছবি এঁকেছেন অলোক ধর। 'মাথা নিয়ে মাথাব্যথা'র ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। 'নোজদের অদ্ভুত বাড়ি' ও 'বাড়ির নীচে নদী'র ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র। 'পসির সঙ্গে একটি দুপুরে'-এর প্রথম ছবি অজিত সোম ও দ্বিতীয় ছবি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তুলেছেন। 'ধাঁধা আর ধাঁধা', 'আচ্ছা বলো তো' ও 'হাঁসের ছানা'র ছবি এঁকেছেন অহিভূষণ মালিক। 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি মদন সরকার এঁকেছেন। 'লেখাপড়া'র ছবি তুলেছেন তপন দাশ। বিধান শিশু উদ্যানের ছবি তুলেছেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। 'খেলাধুলো' বিভাগে পার্ক ইয়ং সুন ও মিৎসুরু কোনোর ছবি তুলেছেন মোনা চৌধুরী; অন্যান্য স্থানীয় ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪
মে ১৯৭৭

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
দেড় টাকা

সম্পাদক :
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল :
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সূচীপত্র

অশরীরী

লীলা মজুমদার

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে, চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে, কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য সে-সব তোমরাই ভেবে নিও।

আমার বয়স তখন ২২ ; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড়-সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচকুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি আদৌ আছ সে-কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিম্বা চলা-ফেরা, কিম্বা কথা-বলার ধরন গজালেই চাকরিটে যাবে। পানা-পুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে ; সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে ; এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কী বলছ বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে, নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি

মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ও-রকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিছু শক্ত কাজ নয়, কিছু করতে হবে না, স্রেফ নেই হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখা-পড়া জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

বড়-সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা! চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে নাকি? কী নাম তোমার?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

বড়-সায়েব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভাল। মাইনে নেবার সময় নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনো দুজন লোকের এক রকম আঙুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ দুই শো টাকা'। আচ্ছা, যেতে পারো।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড়-সায়েব হেসে বললেন, "আচ্ছা, তিন শো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তারপরের ছয়মাসে কোথায় যে না গেলাম, কী যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই, শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাইগুদোমে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড়-সাহেব খুশি হওয়ায় মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের কাগজে বড়-সায়েবের সে কী প্রশংসা!

সে যাই হক, শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনী কাজ হয়নি, তাইতে সকলের সন্দেহ হল, নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিস বেরুল—টিপ বোতাম পরিষদের প্রথম সভা গ-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার, সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড়-সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।"

রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন, বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে, কন্ডাক্টর টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। শস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম্ হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল, ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয়নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তাহলে পকেট-মারদের। একটা চিমড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—"ও মশাই অমন কাজও করবেন না। ঐ বাঁশ বাগানের পথ দিয়ে একটি মাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান! দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়াল-ও না।"

লোকটা ভয়ে-ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকে মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁফ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন-পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ওপারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কী শিখলাম!

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড

বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসুর
দারুণ রোমাঞ্চকর উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারদিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটান বনের মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাঁধানো প্রকাণ্ড সদর-সরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে সেঁধিয়ে গেলাম, সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ংকর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে, বাইরে এক বিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপচি-ঘুপচি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর, কে বলতে পারে।

সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে-যেতে বুঝলাম যে, কেউই আলো চায় না, কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না; সকলের একরকম কাপড় চোপড়, চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়-চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে। বেরুবার পথ ঐ একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয়নি, খোলা যায়ও না।

ফ্যাঁশফেঁশে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্রুরদের

আমি এখন ছোট...

আমিও তো বড় হবো

বড় হ'য়ে বইটই প'ড়ে, লেখাপড়া শিখে আমিও বাবার মত কাজকর্ম করবো। আমার বাবাও তো ছোটবেলা থেকে তাই করেছে···আজ আমাদের বাড়ি···গাড়ি। দিদির মত আমিও কলেজে পড়বো। তারপর দিদির বিয়ে। সে কী মজা, কত হইচই। তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারছি না।

আপনার ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, নিজেদের অবসর-জীবনের সংস্থান··· এ সব কিছুরই ব্যবস্থা করার মত নতুন নতুন সঞ্চয় প্রকল্প আজ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালন অনেক সহজ করেছে। আমাদের **'ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট'** এই রকমই একটি সঞ্চয় প্রকল্প।

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট প্রকল্পে

★ মাসে ৫০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ২০,৯০০, অথবা ২০ বছর পরে ৩৮,৩০০,।

★ মাসে ১০০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ৪১,৮০০, অথবা ২০ বছর পরে ৭৬,৬০০,।

এছাড়া এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

অথবা যে কোন শাখা অফিস।

চেয়ারম্যান : শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB-32/77

জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ঐ কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারো অনধিকার প্রবেশের কোনো সম্ভাবনাই নেই—হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর-সর করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ও-পাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, "সাধারণ নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা অভিন্ন। আলাদা করে চিনুক তো কেউ! বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ! আমাদের—"

আমার গা শিউরে উঠল! আরো গোটা দশেক ছায়া ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে, আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভাল আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের সামনে কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইঁটের টুকরো ফেলে আজ এখানে আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—"

এই অবধি বলে ইঁটটা হাতে করে তুলেছে, অমনি ঘরে একটা সোরগোল উঠল, "না, না, না, না—", তারপরেই মনে হল ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়া-মূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, "নটে! ভজা! কার্তিক! কী, কচ্ছিস্‌টা কী? কই সমঝা!"

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতেই মঞ্চের ওপর উঠে পড়ে, ওরে বাবারে, সেই ছায়া-মূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল! সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেটুনাই জন্মে দেখিনি। আগন্তুকদের আগা-পাশ-তলা ধাঁই-ধড়াক্কা মার! তার মধ্যে কে রব তুলল, "ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন! লাগা! লাগা! ভজা দেখছিস্ কী?"

ভজা বলল, "পেছুলে যাচ্ছেন যে!"

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে, সব নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। ধন্যি পুলিসের ট্রেনিং!

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধহয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পালাতে-পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, "চ'লে চ'ল্! চ'লে চ'ল্। দে'খ্‌ছিস্ ক'ী!"

বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল। ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে ভজারাও দোরগোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম, যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে! তক্ষুনি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুছে গেলাম। ওরা বোধহয় আমাকে খুঁজে পায়নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে?

বড় সায়েবের কাছে আর যাইনি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

অজিত দত্ত

মাথা নিয়ে মাথাব্যথা

মাথা নিয়ে ভারি গোলে পড়ে গেছে নন্দ,
শুরুতেই ভাবে তার কপালটা মন্দ।
স্কুলে গুরুমশায়েরা বলেন সবাই,
"নন্দ রে, মাথা তোর একেবারে নাই।"
বাবা রোজ মাকে বলে সকালে বিকেলে,
"আস্কারা দিয়ে ছেলেটার মাথা খেলে।"
বন্ধুরা মিছিমিছি লাগে তার পাছে,
বলে, "তোর মাথায় বেজায় ছিট্ আছে।"
পড়শীরা বলে "ওই এতটুকু ছেলে,
দুষ্টুমি বুদ্ধিতে খুব মাথা খেলে।"
শেষটায় একদিন নন্দ বেচারি
মাথার বেদনা তার শুরু হল ভারি।
শুয়ে শুয়ে ভাবে তাই সারাক্ষণ ধরে,
মাথা নেই মাথা ব্যথা হয় বা কী করে?

মেরু-রহস্য

বিশাল দরজা ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ঐ বন্দীদের...
কী ভয়ংকর জায়গা...
যে দেখছি লোকজনে ভর্তি একেবারে।
সেই বিরাট ভয়-জাগানো মন্দিরের ভিতরে...
ভাইকিংদের দেবতা— ওডিন, থর আর ফ্রে-র মূর্তি
ডোনাল্ড ছুটে আসে...কিন্তু তাকে আটকে দেওয়া হয়...
বাবা!
ডোনাল্ড!
বিচারকদের মাথার উপরে যে বেদী, হঠাৎ এক মূর্তি এসে হাজির হল সেখানে...
পুরুতমশাই!
বলছে কী জানেন? বলছে, আমরা অসভ্য, বর্বর...ওদের এই পুণ্যভূমি আমরা নাকি দখল করতে এসেছি...কোনও কথা না শুনেই শাস্তি দেওয়া হবে আমাদের...
12-8
বড় পুরোহিতের কথা শুনে জনতাও চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ওদের শাস্তি চাই!
বলছে, আমাদের ছেড়ে দিলে নাকি আরও লোকজন আসবে এই আস্তাগার্দ দখল করতে...আমাদের সব্বাইকে তাই আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে!!

এর পর আগামী সংখ্যায়

এ কেবল ফুটাপাত্রে

কুম্ভক

আচ্ছা কাকু, তুমি তো বলেছিলে, একটা কথা একই রকম করে লিখতে হয় সব সময়ে?

তার মানে?

মানে, এই ধরো, তুমি তো বলেছিলে, পাখিও লেখা যায় পাখীও লেখা যায়। কিন্তু আমি যদি পাখি লিখি, তাহলে সব সময়েই তো পাখিতে হ্রস্ব ই দিতে হবে?

সে তো ঠিক। তা নইলে বোঝা যাবে যে, কিছু ভেবেচিন্তে লিখছিস না তুই।

তাহলে? তাহলে এই বইয়ের বেলায়?

কী হলো বইতে?

এই দেখো আমার 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' বই। এর এক লাইনে যদি থাকে তৈরি, পরের লাইনেই তবে থাকবে তৈরী। এক লাইনে বেশি, পরের লাইনেই 'বেশী'। তার বেলা?

ওই তো মুশকিল। আজেবাজে বই পড়তে দেয় ইস্কুলে।

আজেবাজে বই?—দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের সুতো কেটে বৌদি বলে উঠল: আজেবাজে বই? রীতিমতো সরকারের বই বাপু।

সরকারের? বলো কী? দেখি একটু বইটা।

ক্লাস থ্রি-র 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' ওলটাতেই হল একটু। মিথ্যে বলেনি টুম্পি। কোনো লাইনে তৈরি থাকলে পরের লাইনেই পাওয়া যাবে তৈরী। একটু দেখে নিয়ে বলি: এর মধ্যে একটু কথা আছে রে!

ঘরের কোণ থেকে অমনি নন্তুর গলা পাওয়া গেল: এই-বার নিয়ম বার করবেন কাকু। সাবধান।

বৌদি এগিয়ে এসে বলল: শুনি দেখি কী তোমার নিয়ম।

খুব যে জুতসই নিয়ম তা অবিশ্যি নয়। তবু কেউ কেউ এখনো পর্যন্ত একটা প্রভেদ রাখতে চান তৈরি আর তৈরীতে। বিশেষণটাকে আলাদা করে বুঝিয়ে দিতে চান।

টুম্পি বলে: বিশেষণ? কী রকম?

ধর, আমি যদি বলি 'একটু চা তৈরি করো' বা 'হরিশবাবু এখন বাড়ি তৈরি করছেন', তাহলে হ্রস্ব ই। আর যদি বলি 'আমি যাবার জন্য তৈরী' বা 'বাড়িটা এখন তৈরী', তাহলে দীর্ঘ ঈ। তৈরী জামা, তৈরী পড়া, তৈরী ছেলে......

হাঁপিয়ে উঠল নন্তু। দৌড়ে একখন্ড 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' নিয়ে এসে বলল: দেখি তো। কোথায়? এ তো হ্রস্ব ই দেওয়া আছে।

আরেকটি সে তৈরি ছেলে
জাল করে নোট গেছেন জেলে।

দীর্ঘ ঈ তো নেই এখানে?

ওই যে বললাম, এটা মানে না সবাই। কিন্তু ডিক্‌শনারিতে এখনো আছে ওই প্রভেদটা। যেমন ধর্, খুশি আর খুশী। গান করিস না 'এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা'? কিন্তু, অন্যদিকে, এবার তুমি খুশী? আমার খুশি, কিন্তু, আমি খুশী। তেমনি বেশি আর বেশী। প্রভেদটার যে কোনো দরকার আছে তা মনে হয় না, তাহলেও সরকার হয়তো সেটা মানতে চায়।

রাখো, তোমার সরকার।—গর্জে উঠল বৌদি। 'সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী বাড়ি' আর 'এলোমেলোভাবে তৈরি ঘর', এর মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? দুটোই তো বিশেষণ।

তাই আছে না কি?

তবে আর বলছি কী! যখন যেমন খুশি, তখন তেমন লিখেছে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়াও, দেখবে বড় বড় হরফে ঝুলছে জরুরি অবস্থার সুফল 'সুষ্ঠ শৃঙ্খলা-বোধ'। আরে, সুষ্ঠু কথাটা যদি সুষ্ঠুভাবে লিখতে নাই পারবি তো ছেড়ে দিলেই হয় শব্দটা। শব্দের কি অভাব আছে?

নন্তু বলল: এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি মা। এই একটা জায়গায় হয়তো উ-কারটা ভুলে গেছে দিতে।

আমিও তো প্রথমে ভেবেছিলাম তাই। তারপরে যে দেখি একের পর এক ট্রামের গায়েও দগ্‌দগ্ করছে ওই 'সুষ্ঠ'ই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি: সত্যি। যে কোনো দুটো ট্রামের মধ্যে একটায় দেখবে 'পরিকল্পনা সংস্থ্যা'র প্রচার। সব জায়গায়, সব জায়গায়। স্বাস্থ্যের য-ফলাটা কী করে যে সংস্থার ঘাড়ে এসে চাপল!

বৌদি জিজ্ঞেস করে: তাহলে? এ-দুটোর সঙ্গে দিনরাত বক্‌বক্ করে কী লাভ হবে তোমার ভাবছ? কাগজ খুললেই বড় বড় হরফে দেখবে 'আকাঙ্ক্ষা'র বদলে 'আকাঙ্খা', দোকানে গেলেই দেখবে 'প্রতিষ্ঠাণ', সরকার শেখাবে সুষ্ঠ আর 'সংস্থ্যা'। তৈরি তৈরীর কথা আর নাই তুললাম। কার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি?

এক গাল হেসে নন্তু আওড়াল:

এ কেবল দিনেরাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।

বাস টুম্পি, বাঁচা গেল, আর নিশ্চয় বানান শেখাবে না কাকু।

আমিও একটু হেসে বলি: অত কি সহজ? দেখে ভুল শিখবি বলেই তো আটঘাট বাঁধছি। কেউ কেউ দেখে শেখে, কেউ কেউ ঠেকে শেখে। আমরা না হয় ঠেকেই শিখব!

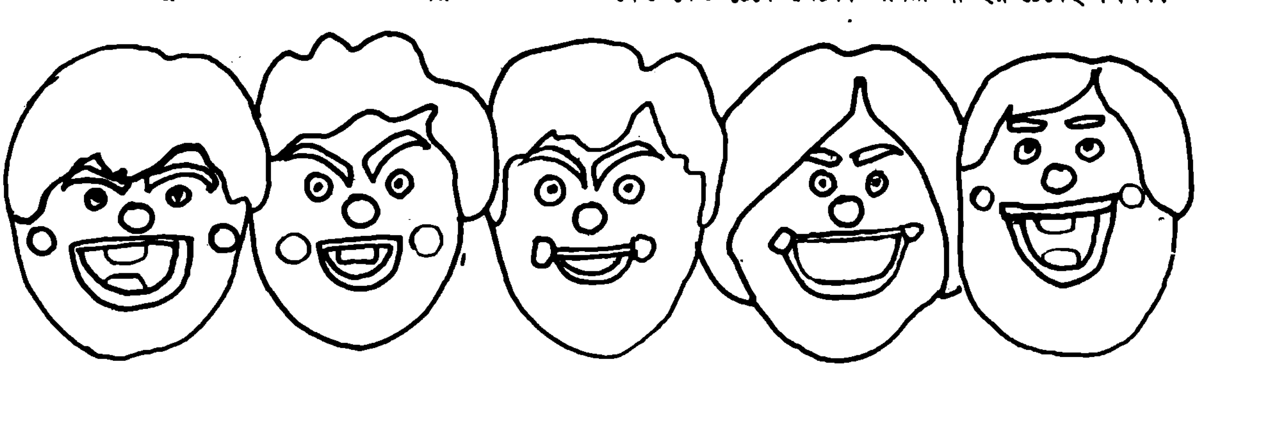

দ্রব্যগুণ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

রাস্তা পার হতে গিয়ে চোখে পড়ল উল্টোদিকে দেশপ্রিয় পার্কের রেলিঙে কিছু ছবি ঝোলানো। সারি সারি কুড়ি-পঁচিশটা ছবি—কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে, কোনোটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা ছবির পাশে দাঁড়ানো একজন বুড়োগোছের ভদ্রলোককে আরো বেশি করে নজরে পড়ল কেন বলতে পারব না। এক-একজন লোকের ভিড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকে, যেমন টোনি গ্রেগ। ইনি মনে হচ্ছে সেইরকম একজন।

বাস স্ট্যান্ডের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আড় চোখে লক্ষ করতে লাগলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে মনে হচ্ছে বিয়েবাড়িতে চলেছেন. কোঁচার পাড়টা কোঁচকানো-কোঁচকানো। মায়ের অ্যালবামে ছবি দেখেছি দাদুর বাবার—ঠিক ঐরকম ধুতি পরা। শুনেছি তিনি বিকেলে হাইকোর্ট থেকে ফিরে এক ঘণ্টার জন্যে ধুতি পরতেন, সেইজন্য চাকর সারাদিন ধরে একটি ধুতি কোঁচাত, যদিও একবার পরা হয়ে গেলে উনি সেই ধুতি আর দ্বিতীয়বার পরতেন না। এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে মায়ের দাদুর বন্ধু হলে মানাত। সোজাসুজি অভদ্রের মত না তাকিয়ে আড়চোখে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। খুব ফর্সা লোকটি, চুল কাঁচা-পাকা মেশানো, থাক-থাক নেমে এসেছে কানের তলা অবধি, হেভি চেহারা, তবে ভুঁড়ি নেই। চশমাও নেই, কিন্তু চোখের চাউনিটা কেমন যেন দিশেহারা-দিশেহারা।

রুনুকে বললাম, "তুই একটু দাঁড়া তো। মনে হচ্ছে কোন্ বাসে উঠতে হবে বুঝতে পারছেন না। আমি একটু বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

এরকম ভাল কাজ করতে চাওয়ার আসল কারণ হল আমার হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। গল্পটা হল এই :—একজন বুড়ো ভদ্রলোক লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছেন আর বলছেন ঘোড়ার গাড়িগুলো সব গেল কোথায়? আসলে তাঁর স্মৃতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ঐ পাড়ার একটি ছেলে তাঁকে বাড়ি পৌঁছতে সাহায্য করেছিল। উনি মারা যাবার পর উইলে দেখা গেল ছেলেটির জন্যে সাত হাজার পাউন্ড না কত যেন বরাদ্দ আছে। ছেলেটির সঙ্গে তাঁর পরে দেখা না-হলেও তার উপকার তিনি ঠিকই মনে রেখেছিলেন। অবশ্য ছেলেটা বুদ্ধি করে নামঠিকানা দিয়ে রেখেছিল ভাগ্যিস, তা না

হলে কিছুই হত না। পরে জানা গিয়েছিল বুড়ো ভদ্রলোক বিরাট বড়লোক, অনেক কলকারখানার মালিক।

আমার দুম করে মনে হল, হয়ত ইনিও সেরকম একজন শিল্পপতি হবেন। চেহারাটা তো সেইরকমই দেখাচ্ছে। কাজের চাপে নির্ঘাত স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। এই আমার সুযোগ। ওহ, হঠাৎ আমার নামে একখানা সাত হাজার টাকার চেক এলে ছোড়দি-বড়দিরা যা অবাক হবে! আমি অবশ্য হব না, কারণ আমি তো আগে থেকেই জানি।

ভাবতে-ভাবতে এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেছি। ভদ্রলোক ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছেন, একটুও নড়েননি। মাথা নিচু করে মাটিতে কিছু খুঁজছেন মনে হল।

"আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?" খুব ভদ্রগলায় জিগ্যেস করলাম। 'দাদু' কথাটা মুখের গোড়ায় এসে গিয়েছিল। বহু কষ্টে সামলে নিলাম। দাদু বললে অনেকে বিরক্ত হন।

"না, মানে সাহায্য তুমি আমায় কী করে করবে? কিছু যদি মনে না করো, তুমি কে?"

"আমার নাম কৌশিক চক্রবর্তী, এখানেই থাকি।" প্রথমেই ঠিকানা কিম্বা বাবার নাম বলে দেওয়া ঠিক হবে না, কারণ তাহলে উনি ভাববেন আমি সাত হাজারের জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

"আপনি কি কিছু খুঁজছেন?" আমি খুব সহজ গলায় জিগ্যেস করি, "পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে গেছে?"

"না না না, মানিব্যাগ না—সে অনেক দামী জিনিস।" শেষের কথাগুলো বলবার সময় ওঁর গলাটা ফিসফিসে হয়ে গেল। আমার কাছে ঘেঁষে এসে কাঁধে হাত রাখলেন।

"কোথায় যে ফেললাম! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গেছি,

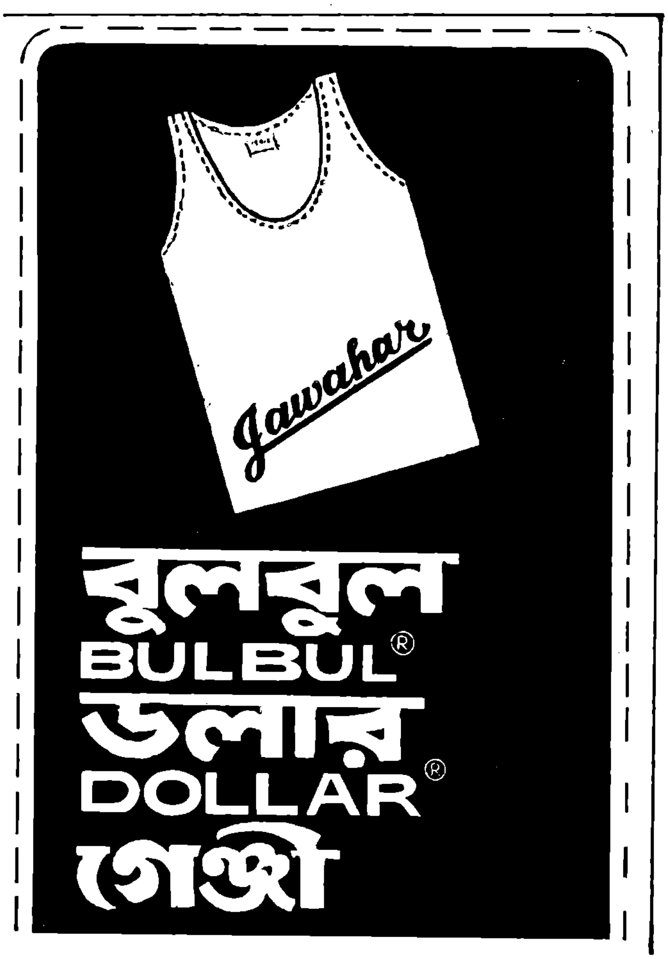

সেখান থেকে ডাক্তারের কাছে, তারপর—" বলতে বলতে থেমে গেলেন ভদ্রলোক, মুখ এই বড় হাঁ হল। "সর্বনাশ করেছে। ভুল করে কি তাহলে ব্যাঙ্কে জমা করে এলাম?"

ইতিমধ্যে রুনু রাস্তা পার হয়ে এসে হাজির। দু-চোখে কৌতূহল। সাত হাজারে ভাগ বসাতে ইনিও উপস্থিত। আর তর সয়নি! সত্যি এরকম বন্ধুবান্ধব দিনরাত ঘুরঘুর করলে কি কোনো ভাল কাজ করা যায়? একজন বৃদ্ধ লোকের উপকার করার চেষ্টা করছি, তার মধ্যেও এসে নাক গলানো চাই।

"কী জমা করে এসেছেন দাদু?"

উহ্ রুনুটার কথা শুনে তো আমার প্রেসটিজ ঢিলে। কী আবার লোকে ব্যাঙ্কে জমা করে, টাকা ছাড়া? তার ওপর 'দাদু'! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ইনি একজন শিল্পপতি, হঠাৎ স্মৃতি লোপ পেয়েছে। এখন আমার উচিত এঁকে কোথাও চা খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া। গল্পের ছেলেটিও তাই করেছিল। রুনু যদি আমাদের সঙ্গে সেঁটে থাকে তাহলে আবার ওকেও চা খাওয়াতে হয়। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

"চলুন, একটু বসি কোথাও। তাহলে আপনার মনে পড়ে যাবে।" আমি সন্তর্পণে ওঁর হাত ধরে সুতৃপ্তির দিকে পা বাড়ালাম। ভদ্রলোক আপত্তি করলেন না, আমার হাত ধরে দিব্যি বাধ্য ছেলের মত গুটগুট করে এগোতে লাগলেন। একটা সাতচল্লিশ নম্বর ঘ্যাঁক করে ঘাড়ের কাছে এসে ব্রেক দিল। উনি আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

পিছনে রুনুটা ঠিক ফেউ লেগে আছে। গোটাকতক রিকশা আর একটা ষণ্ডামার্কা গোরুকে পাশ কাটিয়ে কোনমতে ওদিকের ফুটপাথে পৌঁছেছি—ঘাড়ের কাছ থেকে রুনুটা সমানে বকবক করে চলেছে। "কোন ব্যাঙ্ক আপনার? স্টেট ব্যাঙ্ক নাকি? সেখানে গেলে হয়ত মনে পড়ে যাবে।"

আমি পিছন ফিরে চোখ টিপলাম। জানি তাতে কোন ফল হবে না। ভেতরে ঢুকে বললাম, "দু কাপ চা। যেন বেশ গরম থাকে।" বলেই ভাবলাম শিল্পপতিরা কি এই সময় কফি খান? তাহলে কোনো মাদ্রাজী দোকানে গেলে হত।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল "তিন কাপ।" বলেই অপেক্ষা না করে ঝড়াত করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। রুনুটাকে যে কত শেখাব! এও জানে না বড়দের সামনে ওরকম আগেভাগে বসতে নেই! তার ওপর ঐরকম বিশ্রী আওয়াজ।

বসে পড়ার পর ভদ্রলোককে খুব নিশ্চিন্ত মন হল। টেবিলে হাত রাখতেই অ্যাশট্রেতে আঙুল ঠেকল।

"এটা কী?" উনি একটু চমকে উঠলেন মনে হল।

"অ্যাশট্রে।"

"ওহ্, অ্যাশট্রে। আমি যদি—কী যেন নাম বললে তোমার? কৌশিক না?"

রুনু বলল, "আমার নাম গৌতম।"

"বেশ, বেশ। গৌতম আর কৌশিক। তোমরা কি এক ইশকুলেই পড়ো?"

"হ্যাঁ, তীর্থপতি।" রুনুকে সামলানো মুশকিল। এবারে নিজের ঠিকানাটা না দিয়ে বসে।

"যা বলছিলাম, আমি যদি এখন একটু সিগারেট খাই তোমাদের অসুবিধে হবে না আশা করি।" বলেই উনি দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগলেন। ওঁর কি পকেট থেকে সব কিছুই পড়ে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলের নানকুদার কাছ থেকে একটা দেশলাই চেয়ে এনে ওঁকে দিলাম।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়ায় দেশলাইটা নিভে গেল।

"আর সিগারেট! বলতে গেলে এই জীবনের শেষ সিগারেট। পৃথিবীর শেষ সিগারেটও বলতে পারো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তো সব শেষ।"

সমস্তক্ষণ 'মারা যাচ্ছি, মারা যাচ্ছি' ভাবাটা এক ধরনের অসুখ। কী যেন একটা নামও আছে তার। শিল্পপতি ভদ্রলোক দেখছি এই অসুখে ভুগছেন।

রুনু ভুরু কুঁচকে ওঁকে দেখতে লাগল। আমি চুপচাপ বসে চা খেতে লাগলাম। শিল্পপতি বললেন, "ভাবতেও খারাপ লাগছে এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য আমিই দায়ী হব। তোমাদের মত নিষ্পাপ শিশুরা—দুধের বাছারা সব—"

রুনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমার এই মার্চে পনেরো পুরো হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরো কত স্কুলের কত ছেলেমেয়েরা—দুধের বাছারা সব—কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে যাবে—দড়াম করে এক বিকট বিস্ফোরণে সমস্ত শহর কেঁপে উঠবে—চুরমার হয়ে পড়তে থাকবে তিনতলা, চারতলা, পঁচিশতলা সব বাড়ি—চাদ্দিকে ধুপধাপ, ঝুপঝাপ—উহ্, সে দৃশ্য মনেও আনা যায় না।"

রুনুর তো এই শুনে মুখ শুখিয়ে পামশু। আমিও পিঠ খাড়া করে বসলাম। শিল্পপতি বলে চললেন, "তোমরা আমাকে পাগল ভাবছ। মনে করছ আবোল তাবোল বকছি। তাহলে তো বেঁচে যেতাম ভাই। শুধু আমি কেন, এই শহরসুদ্ধ লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে পার পেয়ে যেত। কিন্তু সে তো হবার নয়। সেই সর্বনেশে বস্তুটি নিশ্চয় এতক্ষণে তার স্বরূপ ধারণ করে ফেলার পথে।"

"বস্তু?" আমরা দুজনে সমস্বরে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ, বস্তু।" ভদ্রলোক মলিন হাসি হাসলেন। "বস্তুটি বড় জাগ্রত। আমার গুরুদেবের স্বপ্নে পাওয়া বস্তু—জাগ্রত না হয়ে যায় কোথায়। গুরুদেব বললেন, ওরে বেটা, এই বস্তু কোমরে ধারণ কর, তারপর প্রতি অমাবস্যার রাতে ঈশান কোণের দিকে মুখ করে এক পায়ে খাড়া হয়ে নিশ্বাসে পাঁচ বার এই মন্ত্র জপ কর,—তিন মাসের মধ্যে দেখবি কোথায় তোর ব্লাডপ্রেশার, কোথায় তোর আর্থ্রাইটিস—আবার যদি কোঁচানো ধুতি পরে লেকে চক্কর দিতে না পারিস তাহলে আমি গেরুয়া ত্যাগ করে প্যান্টশার্ট ধারণ করব। কিন্তু একটা কথা, যদি কোন অমাবস্যায় এক নিশ্বাসে পাঁচবার মন্ত্র বলতে গিয়ে দম নিয়ে ফেলিস, তো সেদিনই বুঝবি ও-বস্তুর গুণ নষ্ট হয়েছে। সেই সুযোগে ওর মধ্যে ভর করবে সাংঘাতিক অপদেবতার আত্মা। তখন একমাত্র উপায় সক্কালবেলা উঠে ধৌত বস্ত্র পরিধান করে কাগজের মধ্যে মুড়ে দ্রব্যটিকে জলে ফেলে আসা। আমি বললাম, গঙ্গার জলে গুরুদেব? গুরুদেব বললেন, লেকের জলে হলেও হবে, মোটকথা জলে ফেলা চাই, না হলে অপদেবতার কীর্তি তো জানিস না—মুহূর্তে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, এই রেটে বাড়তে বাড়তে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবে—আর যদি বাড়বার জায়গা না পায় তাহলে সব ফেটেফুটে চুরমার হয়ে যাবে।"

"আপনি কি সেই দ্রব্যটি পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন?" আমি ভয়ে ভয়ে জিগেস করি।

"নিয়ে যাচ্ছিলাম মানে? না নিয়ে গিয়ে উপায় আছে? করেছ কখনো অমাবস্যার রাতে এক পায়ে এক নিশ্বাসে পাঁচ-বার মন্ত্র জপ? দম নেবার জন্যে থামতেই হবে। যাই হোক খুঁত যখন হয়ে গেল তখন ঐ অপবস্তুকে বিসর্জন দিতেই হবে এই মনে করে বেরিয়েছিলাম। বৌমা বললেন, বাবা, সাদার্ন অ্যাভিনিউ যখন যাচ্ছেন তখন আমার এই গয়নার বাক্সটা যদি ব্যাঙ্কের লকারে জমা করে আসেন—"

"তারপর?" দম বন্ধ করে আমি জিগ্যেস করলাম।

"তারপর কী জিগেস করছ? এক পকেটে বৌমার গয়নার বাক্স আর এক পকেটে সেই অপদেবতার ভর-করা দ্রব্যটি নিয়ে বেরিয়েছি, লেক হয়ে ব্যাঙ্কে যাব—"

"আপনি কি গয়না রাখতে গিয়ে সেই বস্তুটা লকারে ঢুকিয়ে এসেছেন?" রুনু এতক্ষণে রহস্যটা ধরতে পারে।

"আর আপনার বৌমার গয়না—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "সেই জন্যই তো বলছি, এই আমার শেষ সিগারেট খাওয়া। আর এই যারা এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, তাদেরও এই শেষ আড্ডা মারা। এতক্ষণে অপদেবতা সেই ছোট্ট লকারের মধ্যে নিজ মূর্তি ধারণ করতে শুরু করেছেন—দুই থেকে চার, চার থেকে ষোলো, ষোলো থেকে—"

অন্যমনস্কভাবে উনি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করতেই কী দুটো জিনিস ঠক করে টেবিলে পড়ল।

"দুটো কাঁচ। আপনার ব্যাগের গায়ে লেগে ছিল।" আমি তুলে দিতে গেলাম।

ভদ্রলোক বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "কই, কোথায়? দাও, দাও। ওরই জন্যে এতক্ষণ..." হাতড়ে টেনে রুমাল দিয়ে মুছে চোখের মধ্যে গুঁজলেন।

"কনট্যাক্ট লেন্স। ঐ দুটোই তো হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যিস তোমরা ছিলে। তা না হলে এতক্ষণে বাসের তলায়।"

ভদ্রলোক চায়ের দাম দিয়ে উঠে পড়লেন। রুনু ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বললেন, "এতক্ষণেও কিছু হয়নি যখন, তাহলে ব্যাঙ্কে গিয়ে একবার ট্রাই করবেন নাকি?"

"ব্যাঙ্কে কেন?"

"ঐ যে অপদেবতার ভর করা বস্তু—"

ভদ্রলোক আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন। "ওহে খোকা, অপদেবতাকে কি কেউ পকেটে করে ঘুরে বেড়ায়? তাছাড়া আর্থ্রাইটিস থাকলে আর সোজা হয়ে হাঁটছি কী করে? এতক্ষণ তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম, তাও বুঝতে পারোনি?"

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাঁচিল টপকে ওদের বাড়িতে ঢোকার সময় কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের নিখোঁজ ছেলে কন্দর্পনারায়ণের ছবির সন্ধানে এসে হতাশ হলেন বরদাচরণ। রাজামশাই বলেছেন, যার কাছে রাজকুমারের ছবি পাওয়া যাবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই না শুনে মনোজের বাবা রাখোবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা খুঁজে বার করতে হবে। পুতুলের বাক্স থেকে পিস্তলটা মনোজের কাকা ভজবাবুর হাতে এল। ভজবাবুর হাতে পিস্তল দেখে গোয়ালা হরশঙ্কর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভজবাবু পিস্তলের শক্তি-পরীক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। এদিকে, মনোজদের বাড়িতে সবাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের ছবি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। ছবিটা কিন্তু মনোজের বইয়ের মধ্যে। ভজবাবু পিস্তল হাতে অপমানের শোধ তুলতে গিয়ে হেড স্যার গোলোকবিহারী চক্রবর্তীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে খেপে গেলেন। তারপর একজন পুলিশ কনস্টেবল, তাস-খেলুড়ে, গুলিখোর গোবিন্দ আর বোহেমিয়ান শার্দুলকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে ডাকাতের একটা দলের ওপর পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডাকাতের দলে কানাই মাছওলা ছিল। কানাইকে ওঠবোস করাতে যাবার সময় তিনি ধরা পড়ে গেলেন মেজো সর্দারের হাতে। সর্দার বলল, একে আজ মা কালীর সামনে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু, ঘটনাচক্রে ভজবাবু সে রাতের মতো ডাকাতদের সর্দার হয়ে গেলেন। ডাকাতি হবে রাজবাড়িতে। ওদিকে, দারোগা নিশিকান্ত এক দল সেপাই নিয়ে 'মার্ডারার' ভজবাবুকে ধরার জন্যে মনোজদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তারপর অনেক কাণ্ড—

১২

আদ্যাসুন্দরী দেবী এক হাতে লাঠি আর এক হাতে গুলতি নিয়ে উঠোনে ঢুকবার দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রক্ত-জল-করা গলায় হেঁকে বললেন, "দ্যাখো বাবা দারোগা, ভাল চাও তো বাড়িতে ঢুকবার আগে তোমার সেপাইদের জুতো খুলতে বলো, আর তুমিও খোলো। জুতো পরে যে ঢুকবে, তার আমি রক্ষে রাখব না।"

নিশি দারোগা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ডিউটির সময়ে আমাদের জুতো খুলবার আইন নেই পিসিমা, আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। মারাত্মক খুনীকে ধরতে এসেছি আমরা, ইয়ার্কির সময় নেই।"

আদ্যাসুন্দরী দেবী জীবনে কাউকে ভয় করেননি। গত বছরও গ্রীষ্মকালে একটা চোর জানালা দিয়ে গেঞ্জি চুরি করার চেষ্টা করেছিল বলে আদ্যাসুন্দরী হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দেন। তা ছাড়া গুলতিতে তাঁর হাতের টিপের কথাও সবাই জানে। ব্রত-পার্বণে আম্রপল্লব বা বেলপাতা দরকার হলে তিনি নিজেই গাছে গুলতি মেরে-মেরে আমপাতা বেলপাতা পেড়ে আনেন। কাজেই আদ্যাসুন্দরী দেবীকে যারা জানে, তারা চট্‌ করে এ-বাড়িতে ঢোকে না, একটু চিন্তা করে ঢোকে।

কিন্তু নিশি দারোগা করেন কী? চাকরি বাঁচাতে তাঁকে তো বাড়িতে ঢুকতেই হবে, তা ছাড়া এত লোকের চোখের সামনে যদি তাঁকে বা সেপাইদের জুতো খুলতে হয়, তবে সেটা পুলিশের পক্ষে বেইজ্জতির ব্যাপার।

কিন্তু আদ্যাসুন্দরী দেবীর এক কথা। "খুনী ধরতে বারণ করছে কে? কিন্তু জুতো পায়ে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। রাজ্যের নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে এসেছ বাবা, রাত-বিরেতে কে গোবর গুলে ছড়া দেবে!"

দারোগাবাবু মিনমিন করে বললেন, "আইন নেই, পিসিমা। আমরা ছাপোষা মানুষ, কেন আমাদের লাঠিসোঁটা দেখাচ্ছেন?"

"দেখাচ্ছি কী! যে ঢুকবে জুতো নিয়ে, তার কপালে লাঠির ঘা আছে আজকে।"

কিন্তু সেপাইরা তো আর ঘাসজল খায় না। তারাও নানারকম লোক চরিয়েছে। মেলা ফন্দি-ফিকির জানে।

হঠাৎ হল কী, সেপাইরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপর অন্ধকারে এধার সেধার দিয়ে টপাটপ সব লাফিয়ে-লাফিয়ে দেয়াল ডিঙোতে শুরু করে দিল। বুট-সমেত সেপাইরা ঝুপঝাপ করে ভিতরের উঠোনে পড়ছে। আদ্যাসুন্দরী দেবী মহা খাপ্পা হয়ে ছোটাছুটি করে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাকেই ফটাফট লাঠি লাগাচ্ছেন। কিন্তু একা তিনি কতজনের সঙ্গে পেরে উঠবেন? ওদিকে দরজা ছাড়া পেয়ে আরও সেপাই ঢুকে পড়ছে উঠোনে। আদ্যাসুন্দরী দেবী চেঁচাচ্ছেন, "ডাকাত! ডাকাত! ওরে তোরা পুলিসে খবর দে!"

নিশি দারোগা কপালের ঘাম মুছে রাখোবাবুকে বললেন, "ওরে বাবা, জীবনে এরকম সিচুয়েশন ফেস করিনি। তা আপনাদেরও বোধহয় এ-বাড়িতে একটু ভয়ে-ভয়েই থাকতে হয়, তাই না? ওরকম ডেঞ্জারাস পিসিমা আর মার্ডারার ভাই বাড়িতে থাকলে তো মহা বিপদের কথা মশাই।"

রাখোবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল হচ্ছে নিশিবাবু।"

"সে তো হচ্ছেই।" নিশি দারোগা গম্ভীর হয়ে বলেন, "খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। আমি যতই শান্তি চাই, ততই অশান্তি এসে কপালে জোটে। আপনারা কিছুতেই আমাকে দুদণ্ড চুপচাপ বসে মায়ের নাম করতে দিচ্ছেন না।"

গণেশবাবু এখনো তানপুরা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার একটু সাহস পেয়ে বললেন, "দারোগাবাবু, তানপুরাটা কি নামাব?"

দারোগাবাবু অবাক হয়ে বলেন, "তানপুরা নামাবেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? তানপুরা নামাতে তো পুলিশের পারমিশন লাগে না! তবে এটা গান-বাজনার সময় নয় বটে। তা তানপুরা তুলল কে?"

গণেশবাবু বললেন, "আপনি আমাকে হাত তুলতে বললেন যে!"

"তানপুরা তুলতে বলিনি তো!"

"হাতে তানপুরা ছিল যে!"

দারোগাবাবু একগাল হেসে বললেন, "তাই বলুন, হাতে তানপুরা ছিল। তা তানপুরা নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?"

গণেশবাবু যে পালাবার তালে ছিলেন, তা আর বললেন না, একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, "কোথাও বিশেষ নয়। এই একটু বেড়াতে যাচ্ছিলাম আর কী।"

দারোগাবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, "লোকে ছাতা বা লাঠি হাতে বেড়াতে বেরোয় বটে, কিন্তু তানপুরা নিয়ে কাউকে বেড়াতে শুনিনি তো!"

এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন হঠাৎ ভিতর-বাড়ি থেকে সেপাইদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল। ঝপাঝপ দেয়াল ডিঙিয়ে সেপাইরা এ-পাশে পড়ে পালাচ্ছে।

দেখে নিশি দারোগাও 'বাবা রে বাবা' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাখোবাবু তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার কিছু হয়নি। ও নিশিবাবু, আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? আপনার কিছু হয়নি।"

হয়েছে কী, বাইরে যখন এত সব কান্ড চলছে, তখন বৈজ্ঞানিক হারাধন তার গবেষণাগারে গবেষণার কাজে মগ্ন হয়ে ছিল। চারদিকের এত হৈ-চৈ তার কানেও যায়নি।

ওদিকে মনোজ সরোজ আর পুতুল যখন দেখল, ঠাকুরঝির সঙ্গে পুলিসদের মহা হাঙ্গামা বেধেছে, আর পুলিস জোর করে ঘরে ঢুকছে তখন তিনজন আর থাকতে পারল না।

মনোজ বলল, "ছোটকাকা।"

সরোজ বলল, "ঠিক বলেছিস! ছোটকাকা ছাড়া উপায় নেই।"

পুতুল বলল, "ছোটকাকা ঠিক শিক্ষা দিয়ে দেবে।"

বলতে বলতে তিনজন দৌড়ে গিয়ে দরজার খিল খুলতে লাগল। দুঃখবাবু হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বললেন, "করো কী, করো কী! ফাঁক পেলেই পুলিস ঢুকে পড়বে।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! দরজা খুলে দুদ্দাড় তিন ভাই-বোনে বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকারে বাগান পেরিয়ে তারা সোজা গিয়ে হাজির হল ছোটকাকার ল্যাবরেটরিতে।

হারাধনের ল্যাবরেটরি দেখলে তাক লেগে যায়। সেখানে কী নেই? বাগানের দিক থেকে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে বিরাট একটা উদ্ভিদ-ঘর। কাচের শার্শি দেওয়া এই ঘরটায় নানান ধরনের টবে কিম্ভূত সব গাছপালা। তাতে চাগম (চাল+গম), লামড়ো (লাউ+কুমড়ো) ইত্যাদি গাছও আছে। এ ঘর পেরোলে একটা অন্ধকার-মতো ঘর। চামসে গন্ধে সেখানে টেঁকা দায়। এ-ঘরে অসংখ্য খাঁচায় রাজ্যের পাখি রাখা আছে। পাখিদের মধ্যে কাক, শালিখ, পায়রা থেকে শুরু করে ধনেশ, চিল, শকুনের মতো বিচিত্র সব নমুনা আছে। আর-একটা ঘরে বানর, গিনিপিগ, ব্যাং, খরগোশ, সাদা ইঁদুর। তার পাশের ঘরে নানান ঝাঁপিতে সাপ, বিছে, কীট-পতঙ্গ। এ ছাড়া একটা রসায়নাগার, একটা পদার্থবিদ্যার ঘর আর একটা টেলিস্কোপ-ঘরও আছে।

মনোজ সরোজ পুতুল আলাদা হয়ে তিনজনে তিন ঘরে হারাধনকে খুঁজতে থাকে।

পুতুলই ছোটকাকাকে খুঁজে পেল পাখির ঘরে। সেখানে বৈজ্ঞানিক হারাধন একটা কাকের খাঁচার সামনে বসে একমনে একটা প্যাডে কী লিখছে।

পুতুল হাঁফাতে-হাঁফাতে ছুটে গিয়ে বলে, "ছোটকাকা,

পুলিস! মেজোকাকাকে ধরতে এসেছে। কী ভীষণ কান্ড দেখবে চলো।"

বৈজ্ঞানিক হারাধন এত চিন্তাকুল যে, প্রথমটায় পুতুলকে চিনতেই পারেনি। অনেকক্ষণ বাদে চিনতে পেরে বলল, "কী বলছিস?"

পুতুল তখন খাঁচাটার মধ্যে রাখা কাকটাকে একমনে দেখছে। কাকটার গলায় এখনো পৈতে জড়ানো, পায়ে একটা ঝুমঝুমির মতো কী যেন বাঁধা। খুবই চেনা কাক।

পুতুল অবাক হয়ে বলল, "আরে! এই কাকটাই তো সকালে আমাদের বাড়িতে কুরুক্ষেত্র করেছে। এটার জন্যই কত সব কান্ড হয়ে গেল! তুমি কাকটাকে ধরলে ছোটকাকা?"

হারাধন বিরক্ত হয়ে বলে, "ধরব কেন? এটা তো আমারই কাক। সকালে ছেড়ে দিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্টের জন্য। তারপর বিকেল হতেই আবার নিজে থেকে এসে খাঁচায় ঢুকেছে।"

"তোমার কাক! তোমার কাক এত বদমাশ কেন বলো তো!"

হারাধন একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে, "বদমাশ হবে কেন? একটু তেজী আর কী! অন্য আর-পাঁচটা সাধারণ কাকের মতো নয়। তা সে ওর দোষ নয়, আমিই নানারকম ওষুধ আর ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে-দিয়ে এটাকে ওরকম বানিয়েছি। এ আর কী দেখছিস! চারটে যা হনুমান বানিয়েছি না, তারা একেবারে ডাকাত। ছেড়ে দিলে লঙ্কাকাণ্ড করে আসবে।"

সদ্য প্রকাশিত

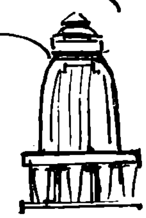

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ"
—সেই মৃত্যুহীন জীবনের কথা
বলেছেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ছবি এঁকেছেন
সূর্য রায়। [২.২৫]

* *

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায়

কুমির সাহেব

...কুমির সাহেব
এমনি করে সাধেন
আর অঝোরে মায়া-কাঁদন কাঁদেন।
এমন মজার গল্প, মজার ছড়া, মজার
ছবির বই ওদের হাতে তুলে দিয়ে দেখুন
কি হয়। [৩.০০]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

আষাঢ়ে স্বপ্ন

বা জানোয়ারের মেলা

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা জন্তু জগতের
অনবদ্য কাহিনী ও অনবদ্য ছবি। [৩.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

পুতুল হারাধনের হাত ধরে টানতে-টানতে বলল, "হনুমানের কথা পরে। আগে চলো। পুলিসের সঙ্গে ঠাকুরঝির মারামারি হচ্ছে যে!"

"বলিস কী!" বলে হারাধন লাফিয়ে ওঠে।

"শুধু তাই বুঝি! পুলিস আবার মেজোকাকুকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। যা বিচ্ছিরি কাণ্ড না, আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।"

হারাধন দুই লাফে ল্যাবরেটরির পার হয়ে উঠোনের দিকে দরজা খুলে দেখে, বাস্তবিক সারা উঠোন জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। পাঁচিল টপকে-টপকে সব সিপাইরা উঠোনে নামছে আর ঠাকুরঝি প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করছে। কিন্তু তারা কাবাডি খেলোয়াড়ের মতো ঠাকুরঝির লাঠির নাগাল এড়িয়ে দৌড়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ঠাকুরঝি চেঁচাচ্ছেন, "ডাকাত! ডাকাত! ওরে তোরা কেন পুলিসকে খবর দিচ্ছিস না?"

ঠিক এই সময়ে অন্ধকারে সতীশ ভরদ্বাজ মশাইও উঠোনে ঢুকে পড়েছেন। তিনি বললেন, "উঁহু, এরা ডাকাত নয়, এরা হল পুলিস। আপনি বরং ডাকাতদের ডাকুন, নইলে এ পুলিসদের ধরবে কে?"

আদ্যাসুন্দরীর তখন হুঁশ হল। তিনি একটা রোগা পুলিসের ঠ্যাঙে পটাং করে লাঠির ঘা বসিয়ে নতুন করে চেঁচাতে লাগলেন "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, শিগগির ডাকাতদের খবর দাও। আমাদের বাড়িতে পুলিস পড়েছে।"

তখন চারদিকে আরও কয়েকজন চেঁচাল, "ওরে, শিগগির ডাকাতদের খবর দে, এ-বাড়িতে পুলিস ঢুকেছে।"

হারাধন দৃশ্যটা দু মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল। তার দুধারে পুতুল, সরোজ, মনোজ। তারপর ধীরে-ধীরে ভাইপো-ভাইঝিদের হাত ধরে ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "শোন্, এখন আমি যে ব্যবস্থা করব তা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিসের ছদ্মবেশে অন্য কোনো রাষ্ট্রের চর আমার ফরমুলা চুরি করতে এসেছে। এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

বলে হারাধন গটগট করে গিয়ে তার জীবজন্তুর ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সরোজ, মনোজ আর পুতুল। ঘরের একেবারে কোণের দিকে চারটে বিশাল খাঁচা। সেগুলোর চারদিকে চটের পর্দা ফেলা। হারাধন গিয়ে খাঁচার পর্দা তুলে দিল। ভিতরের দৃশ্য দেখে সরোজ মনোজ আর পুতুলের চোখ ছানাবড়া। তারা তাড়াতাড়ি ছোটকাকার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

খাঁচার ভিতরে চারটে বিশাল চেহারার হনুমান। এত বড় হনুমান যে থাকতে পারে, তা তিন ভাইবোনের জানাই ছিল না। সরোজ প্রথমটায় বলে উঠল, "গোরিলা।"

"বনমানুষ!" পুতুল বলে ওঠে।

মনোজ বলল, "না, হনুমান। তবে বড্ড বড়।"

হারাধন খাঁচার দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল, "এ হচ্ছে গোরিমান।"

"তার মানে?" সরোজ জিজ্ঞেস করে।

মনোজ ছোটকাকার ব্যাপার-স্যাপার ভালই জানে, সে তাই বলে উঠল "খানিকটা গোরিলা, খানিকটা হনুমান, না ছোটকাকা?"

"হুঁ। তবে ওষুধ দেওয়া হনুমান, আর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কারসাজি। তোরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে সব ঘরে ঢুকে যেতে বল। আমি হনুমান ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর লঙ্কাকাণ্ড কাকে বলে তা সবাই টের পাবে।"

সরোজ, মনোজ আর পুতুল দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরঝি, ঠাকুমা, মা, কিরমিরিয়া সবাইকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আর সেই সময়ে আধো অন্ধকারে অতিকায় চারটে বিভীষিকা বিভীষণ-লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে এসে পিলে চমকানো ডাক ছাড়ল "গাপ! ধর! গাপ! ধর।"

সে-ডাক শুনলে রক্ত জল হয়ে যায়, সে-চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, তারা এক একটা পুলিসকে নেংটি ইঁদুরের মতো এক-এক হাতে তুলে যখন এ-ধার ও-ধার ছুঁড়ে ফেলছিল, তখন তাদের এলেম দেখে সবাই তাজ্জব।

প্রথমটায় পুলিসরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। একজন আবার একটা হনুমানকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়েও উঠেছিল, "এইবার খুনীকে ধরেছি!" তারপরই সে হঠাৎ তারস্বরে বলতে লাগল, "না না, এর যে লেজ রয়েছে! ও বড়বাবু, খুনীর কি লেজ আছে নাকি?"

তারপরই দেখা গেল হনুমানকে জড়িয়ে ধরেছিল যে পুলিসটা, সে শূন্যপথে উড়ে পাঁচিলের ওধারে পড়ল। একজন পুলিশ গিয়ে পড়ল টিনের চালে। হনুমানদের একজন দুটো পুলিসকে দু বগলে নিয়ে মহানন্দে এক চক্কর নাচ নেচে নিল।

সতীশ ভরদ্বাজ ঘর থেকে জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে বললেন, "আদ্যাদিদির ডাকের গুণ আছে। এ যে দেখছি চার-চারটে পালোয়ান ডাকাত! না...না...ডাকাত তো নয়! সর্বনাশ! এ যে স্বয়ং রামচন্দ্রের ভক্ত। ও আদ্যাদিদি, কলিকালে দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে ম্লেচ্ছরা ধর্ম মানতে চায় না। কিন্তু নিজের চোখে সবাই এসে দেখুক ভক্তের বিপদের সময় ভগবান তাঁর অনুচর পাঠান কিনা। ঐ দেখ সবাই, দু চোখ ভরে চেয়ে দেখ, স্বয়ং রামভক্ত হনুমানেরা এসেছেন।... আহা! কী করাল বিশাল চেহারা! কী সাংঘাতিক গায়ের জোর! ...জয় বাবা হনুমানের জয়!"

বাইরে রামু আর রঘুও বিকট সুরে চেঁচাচ্ছিল, "জয় বজরঙ্গবলী! জয় মহাবীর হনুমানজীকি! জয় রামভগবানকি! জয় জানকী মায়জীকি!"

সেই বিশাল হনুমানের মারমূর্তি দেখে পুলিসরা দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুদ্দাড় দৌড়ে পালাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সব ফর্সা। খালি উঠোনে হনুমানগুলো লাফাচ্ছে। আদ্যাশক্তি দেবী তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘর থেকে এককাঁদি কলা নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "খাও, বাবারা খাও।"

হারাধন দরজার আড়াল থেকে সাঙ্কেতিক শিস দিতেই হনুমানগুলো কলার কাঁদি নিয়ে চোখের পলকে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল।

বাইরে নিশি দারোগা, রাখোবাবু, দুঃখবাবু, গণেশবাবু বা পাড়ার লোকজন কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না কাণ্ডটা কী! সবাই দেখলেন, সেপাইরা কার যেন তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে। একজন সেপাইও অবশ্য দাঁড়াল না, যাকে ধরে জিজ্ঞেস করা যায় যে ব্যাপারটা কী। সবাই পাঁই পাঁই করে ছুটে পালাল।

নিশি দারোগা দুহাতে রাখোবাবুকে জাপটে ধরে চেঁচাতে লাগলেন, "বাবা রে, বাবা রে! ভূত! ডাকাত! খুনী! রাখোবাবু, রক্ষে করুন।"

দুঃখবাবু তাঁর খিল-আঁটা ঘরের মধ্যে থেকেও ভয়ে পড়ার টেবিলের তলায় ঢুকে গেলেন। গণেশবাবু তান-পুরাটা গদার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাতে লাগলেন, "আমার কাছে কেউ এলে খুন করে ফেলব বলে দিলাম!"

হনুমানরা চলে গেছে দেখে সতীশ ভরদ্বাজ বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "এখন ঐ ঘোর নাস্তিক হারাধনটাকে ডেকে নিয়ে এসো। দেখে যাক ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা! দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে সব পণ্ডিত হয়েছে। আমার হাঁদুভুঁদুকে তুচ্ছজ্ঞান করে! একদিন বুঝবে ঠেলা, তখন এসে হাতে-পায়ে ধরে বলতে হবে. ঠাকুরমশাই, ধর্মে বিশ্বাস না করে বড় অন্যায় করেছি।"

সেপাইরা সব পালিয়েছে। দারোগাবাবু একা বাড়ি ফিরতে সাহস করছেন না। রাখোবাবু রঘুকে ডেকে টর্চ হাতে দিয়ে বললেন, "যা, দারোগাবাবুকে এগিয়ে দিয়ে আয়গে যা।"

বাড়ি আবার ঠাণ্ডা হলে রাখোবাবু সবাইকে ডেকে মিটিং বসালেন। বললেন, "ভজুটার কোনো খোঁজ নেই। বাড়ির মেয়েরা বাদে সবাই লাঠি, টর্চ বা হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তাকে খুঁজে না আনা পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হবে না। আর এও বোঝা যাচ্ছে না, পুলিসরা হঠাৎ সার্চ থামিয়ে পালাল কেন! সবাই তোমরা বলছ বটে হনুমানে তাড়া করেছিল। কিন্তু তাতে ঘটনাগুলো আরও জট পাকাচ্ছে। প্রশ্ন ওঠে, হনুমানই বা এল কোত্থেকে! হনু-মানগুলোকেও খুঁজে দেখ। এ-বাড়িতে তো তাদের উৎপাত ছিল না!"

এই কথা শুনে হারাধন খুব গম্ভীর হয়ে গেল। আর মনোজ, সরোজ, পুতুল নিজেদের মধ্যে গা-টেপাটেপি করতে লাগল।

সতীশ ভরদ্বাজ জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "ভক্তের ডাকে স্বয়ং ভগবান তাদের পাঠিয়েছিলেন। তাদের আর কোথায় খুঁজবে?"

খোঁজাখুজির নামে দুঃখবাবু বলে উঠলেন, "আমার পায়ে বড় ব্যথা।"

গণেশবাবু বললেন, "আমারও। আমি বরং বাড়ি পাহারা দেব।"

রাখোবাবু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোনো কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন না। ভজুকে খুঁজে না-পেলে অনেক গোলমাল দেখা দেবে।"

তারপর রাখোবাবু সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "আর দেরি নয়। সবাই বেরিয়ে পড়ো। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য পিসিমা একাই যথেষ্ট। তিনি আজ পুলিসের বিরুদ্ধে যে পৌরুষ দেখিয়েছেন, তা কোনো পুরুষেও দেখাতে পারেনি। কাজেই আমি তাঁর ওপর বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। পুরুষরা সবাই ভজুকে খুঁজতে যাবে।"

একথার পর সবাই উঠে পড়ল।

(ক্রমশ)

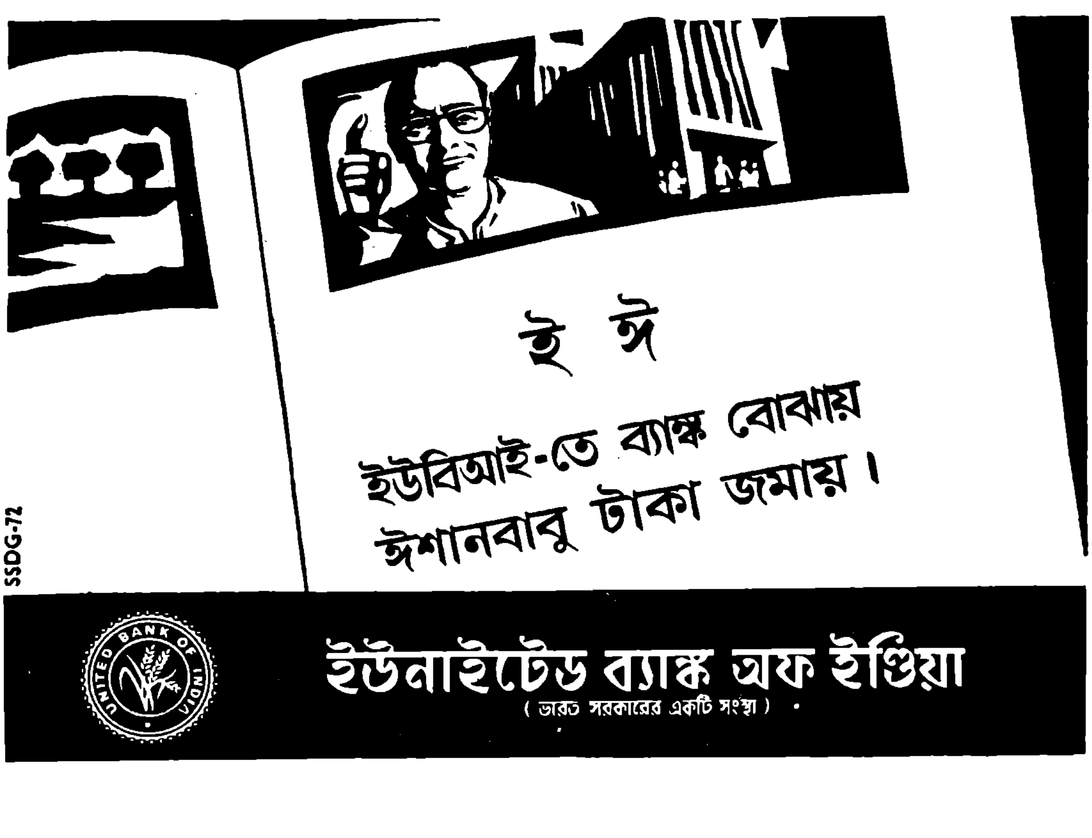

গুপসির সঙ্গে একটি দুপুর

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবারের দুপুরবেলা সবে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু লেখালেখি করতে বসেছি, এমন সময় লোড-শেডিং হয়ে মাথার ওপর পাখাটা গেল বন্ধ হয়ে। ছাদের ছোট্ট নিরিবিলি ঘরে শুধু কী লিখি কী লিখি ভাবছি আর বারবার ঘাম মুছছি—এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ কাটতে কাটতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। লেখার জন্যে মাথার মধ্যে আবছা একটা আইডিয়াও এসে গেছল। ঘাম মোছবার জন্যে পাশে রাখা রুমালটা নিতে হাত বাড়াতেই রুমালের বদলে একটা নরম-নরম কী যেন হাতে ঠেকল আর সঙ্গে-সঙ্গে 'ম্যাও'। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল? এ যে একেবারে 'হযবরল'র গপ্প।

গুপসি না হয়ে অন্য কোনো বেড়াল হলে আমি অবাক হতাম অনেক বেশি। রুমালটা টেবিলের বাঁ ধারে যেখানটায় রেখেছিলাম, ও কখন এসে ঠিক সেখানে চুপিচুপি বসেছে, একেবারে টের পাইনি। গুপসির বয়েস দেড় বছর। ডাক নাম গুবি। যাকে বলে আদুরে নন্দগোপাল এবং মিটমিটে শয়তান—গুবি তাই। আমি ওর দিকে তাকাতেই কান দুটো খাড়া করে গলাটা উঁচু করে আমায় সামনের পা দিয়ে ইশারা করে বলল, আমি যেন ওর গলায় সুড়সুড়ি দিই—তাতে ওর বড্ড আরাম।

এই তো লেখার জন্যে এমন একটি বিষয়বস্তু সামনে রয়েছে, আর আমি কিনা কী লিখি কী লিখি করে এতটা সময় নষ্ট করলাম। ঠিক কোথা থেকে শুরু করব? গুপসির চারটে

মিষ্টি বেড়াল আর দুষ্টু বেড়ালের রঙিন ছবি দেখবে?
ছাব্বিশ আর সাতাশের পাতা দ্যাখো।

পা, একটা লেজ আর ছোট্ট গোলাপি নাকের নীচে সাদা গোঁফ—এইভাবে আরম্ভ করলে তোমরা বলবে, এ তো আমরা জানি।

তাহলে প্রথমেই এমন একটা খবর দিয়ে শুরু করা যাক, যা তোমরা জানো না। যেমন, গুপসির কটা দাঁত। আমি অবিশ্যি ঐ মিটমিটে শয়তানের মুখের ভেতর আঙুল দিতে সাহস পাই না। সুতরাং গুনে দেখিনি ঠিক কটা দাঁত ওর, তবে ও আর একটু বড় হলে থাকা উচিত হবে সব মিলে তিরিশটা দাঁত, ওপরের মাড়িতে ষোলটা আর নীচে চোদ্দটা। গুপসির দাঁতের সঙ্গে বাঘের দাঁতের হুবহু মিল, যদিও গুপসির দাঁত আকারে অনেক ছোট। মাংস আর হাড় চিবিয়ে খাবার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি এসব দাঁত।

লক্ষ করেছি, গুপসি চুপচাপ একা বসে থাকলেই নিজের গা নিজেই চাটে। বেড়ালের এই অভ্যাসটা তোমরাও নিশ্চয় দেখেছ। নিজের সর্বাঙ্গ এঁটো করার জন্যে বেড়ালকে নোংরা ভাবার কোনো কারণ নেই। গুপসির জিভের ঠিক মাঝখানে অনেকগুলো কাঁটার মতো জিনিস আছে যেগুলো দিয়ে রগড়ালে গায়ের ময়লা তো পরিষ্কার হয়ই, এমন কী, খাওয়ার সময়ে মাংস থেকে হাড়-গুলো পর্যন্ত আলাদা হয়ে যায়।

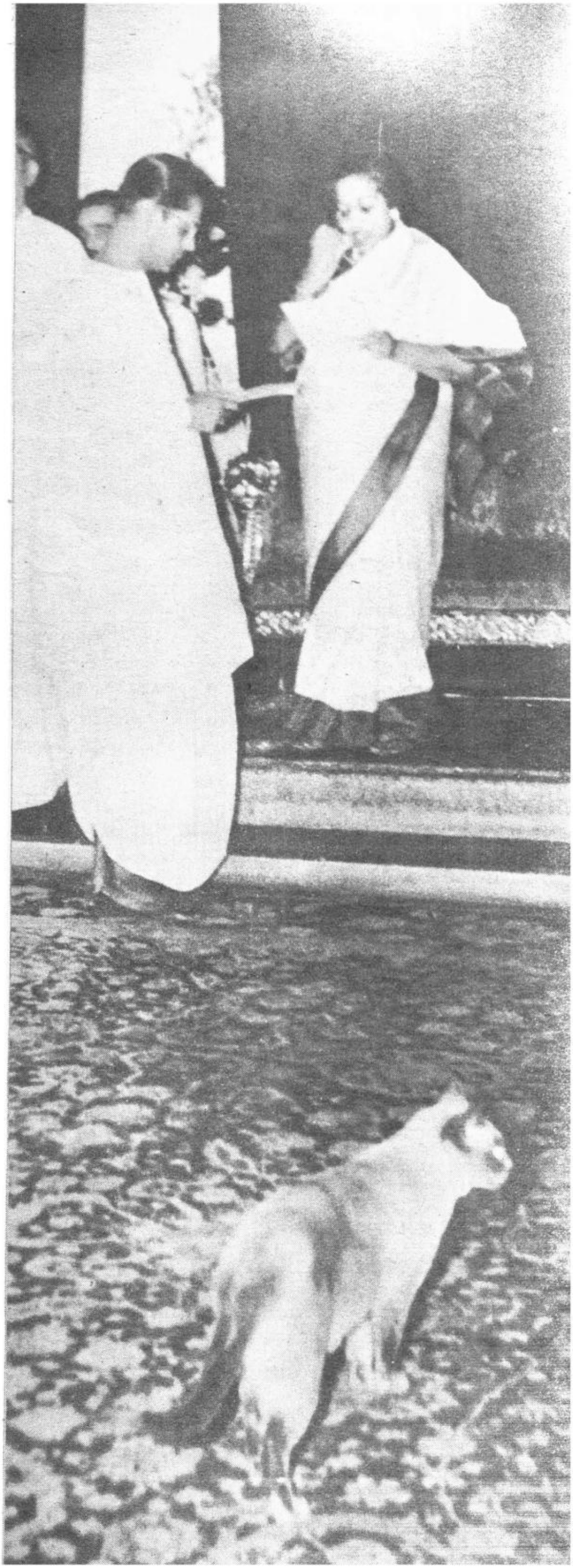

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতার রাজভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই সময়ে এই বেড়ালটি সেখানে হাজির হয়। রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর পোষা বেড়াল এটি।

জ্বলজ্বলে চারটি চোখ। দুটি গুপসির, দুটি তার বন্ধুর

বেড়ালকে হাঁটতে তোমরা সব্বাই দেখেছ, কিন্তু আসল মজার ব্যাপারটা কজন লক্ষ করেছ জানি না। গুপসিকে হাঁটতে দেখে ব্যাপারটা আমার প্রথম নজরে পড়ে। ছাগল কিংবা হরিণ কিংবা ধরো হাতি। এসব চারপেয়ে জন্তু যখন হাঁটে, তখন নজর করে দেখো। দেখবে, তারা যখন সামনের বাঁ পাটা বাড়ায়, তখন পেছনের ডান পাটা সামনে ফেলে, আর যখন সামনের ডান পা বাড়ায়, তখন তার সঙ্গে এগিয়ে দেয় পেছনের বাঁ পা। মানুষের ব্যাপারটাই ভেবে দেখ না। ডান পা আগে গেলে আমাদের বাঁ হাতটা তার সঙ্গে আগে যায়। বাচ্চা ছেলে যখন হামাগুড়ি দেয়, এবং হাত দুটিকে পায়ের মতো ব্যবহার করে, তখন সেও এই অভ্যাসমতো বাঁ হাতের সঙ্গে ডান পা, এবং ডান হাতের সঙ্গে বাঁ পা আগে ফেলে এগোয়। বেড়াল এবং বেড়াল জাতীয় অন্য সব প্রাণীর, অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, চিতা ইত্যাদির হাঁটাটা ঠিক উলটো। অর্থাৎ তাদের সামনের ডান পার সঙ্গে পেছনের ডান পা, এবং সামনের বাঁ পার সঙ্গে পেছনের বাঁ পা আগে পেছনে পড়ে। বেড়ালের চলন দেখলে যে বাঘের কথা মনে হয় সেটা এই জন্যে। অবিশ্যি উট আর জিরাফও কিন্তু বেড়ালের মত হাঁটে। গুপসি বলল, 'ম্যাও'। অর্থাৎ আজ বড্ড গরম। দেখলাম, সে আমার দিকে একটু রাগ-রাগ করে তাকিয়ে আছে, চোখের কালো তারা দুটো গোল থেকে লম্বা সরু রেখার মতো আর গোঁফগুলো খাড়া! গুপসির চোখের তারা দুটো শুধু রাত্তিরবেলায় গোল-গোল দেখায়। কেন জানো? দিনের আলো যত কমতে থাকে, গুপসির চোখের জানলা দুটো, মানে চোখের ঐ কালো অংশটা, অন্ধকারে দেখার জন্যে বেশি খুলে যায়। কিন্তু ঐ গোঁফগুলো কী কাজে লাগে? মানুষের গোঁফের মতো বেড়াল কিংবা বাঘের গোঁফ মোটেই অকেজো নয়। আমরা গোঁফ কামিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারি, কিন্তু বেড়ালের গোঁফ ছেঁটে দিলে বেড়াল খুব অসহায় হয়ে পড়ে, তার চলা-ফেরার পথে কোথায় বিপদ লুকিয়ে আছে কিংবা কোন্ দিকে খুট করে ইঁদুরের শব্দ হল তা সে ভাল করে বুঝতেই পারবে না। বেড়ালের গোঁফের ডগায় আছে সরু সরু স্নায়ু। তার সাহায্যে সে তার চারপাশ সম্বন্ধে সব সময়ে সতর্ক থাকতে পারে।

গুপসি যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন একটা পাজি হুলোর আক্রমণে ওর ঘাড়টা কেটে ঝুলে পড়ে। আমরা তো ভেবেছিলাম বাঁচবেই না। ওর মা তো খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ওর কাছে চুপচাপ বসে বসে কাঁদত। গুপসি যদি মানুষ হত, কিংবা অন্য কোনো প্রাণী, তাহলে সে বাঁচত না। বেড়াল বলেই সে বেঁচে গেল। কেন জান? বেড়ালের গায়ের চামড়াটা খুব আলগা জামার মত ওদের মাংস, মজ্জা, হাড়, শিরা-উপশিরার ওপর জড়ানো। সুতরাং ওপরের চামড়াটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও আঘাতটা ভেতরে গিয়ে পৌঁছয় না। এই জন্যেই হয়তো বলা হয়, বেড়ালের নটা জীবন, বেড়াল সহজে মরে না।

গুপসি একবার হাই তুলে আলস্য ভাঙল। সে যখন হাঁটে কিংবা শুয়ে-শুয়ে আলস্য ভাঙে তখন তাকে দেখে মনে হয় ঠিক একটা খুদে বাঘ। তোমরা বোধহয় জানো না যে, বাঘ আর বেড়ালের পেশীর গঠন আর সংখ্যা প্রায় এক। শুধু বেড়ালের পেশীগুলো বাঘের চেয়ে অনেক বেশি ছোটো আর কম-জোর। এই যে গুপসি আমার সামনে শুয়ে আছে, এমন যদি একটা ওষুধ থাকত যেটা খাওয়ালে ওর পেশীগুলো হয়ে উঠত অনেক বড়, তাহলে গুপসিও তো হয়ে যেত একটা সাদা বাঘ আর আমার অবস্থা যে কী হত তা তো বুঝতেই পারছ। তবে গুপসিরই কিছু কিছু আত্মীয় স্ক্যানডিনেভিয়া, আয়ারল্যান্ড, উত্তর স্কটল্যান্ড এবং আফ্রিকায় আছে, যারা আকারে অনেক বড়, এবং মোটেই পোষ মানে না। এ-সব জঙ্গলে বেড়ালরাই বাঘের সত্যিকার মাসী।

গুপসি আর একবার 'ম্যাও' করতেই আমার ওকে একটু আদর করতে ইচ্ছে হল, আর মনে পড়ল আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরের বেড়ালেরা কত বেশি আদুরে ছিল। প্রাচীন মিশরে বেড়ালের নামে মন্দির পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। এমন কী, বেড়ালের পুজোও হত। ধরো গুপসি যদি পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে জন্মাত, তাহলে ওর মৃত্যুর পর আমায় কী করতে হত জানো? ওর দেহটা সোনার বাকসে পুরে মণিমুক্তো দিয়ে সাজিয়ে মন্দিরের মধ্যে রেখে দিতে হত। আর ধরো যদি ওকে কেউ মারত বা মেরে ফেলত তাহলে তার কী শাস্তি হত বল তো? যাবজ্জীবন কারাবাস কিংবা মৃত্যু।

ইউরোপে কিন্তু বেড়ালের কদর কোনোদিনই খুব বেশি ছিল না। আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগে ইটালিতে বেড়াল পোষা প্রথম শুরু হয়। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে বেড়ালদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল, সে-কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

মধ্যযুগের মানুষ হঠাৎ বিশ্বাস করতে শুরু করল, বেড়ালই যত নষ্টের গোড়া, মানুষের সব রকম দুঃখকষ্টের জন্যে, দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী বেড়াল। সুতরাং বেড়ালদের ডাইনীর চর বলে পুড়িয়ে মারা হত। কত হাজার-হাজার বেড়াল যে মধ্যযুগের ইউরোপে আগুনে প্রাণ দিয়েছে কে জানে।

আজ অবিশ্যি পৃথিবী জুড়ে বেড়ালদের ভারি শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। ব্রাউন রঙের দামী অ্যাবিসিনিয়ান বেড়াল, কিংবা সাদা-কালোয় মেশানো বর্মি-বেড়াল, কিংবা নীল রঙের পারশিয়ান বেড়াল, অথবা লেজহীন ম্যাংকস্ বেড়াল, কিংবা শ্যাম দেশের আশ্চর্য সুন্দর বেড়ালেরা খুব শান্তিতে, সুখে, যত্নে আছে আজকাল। তাদের নিয়ে কত প্রতিযোগিতা, কত তাদের নাম ডাক। আর আমাদের দেশে তো বেড়াল হল মা-ষষ্ঠীর বাহন। তার সেইজন্যে দারুণ খাতির। কলকাতার বেড়ালেরাও বেশ আছে। মানুষের সঙ্গে তাদের খুব বন্ধুত্ব। এই দেখ না, গুপসি আমার টেবিলে রুমালের ওপর কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

চিড়িয়াখানা

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালিঘাট ট্রাম ডিপোতে গিয়ে ট্রামে উঠলাম। তারপর ট্রামে চড়ে চিড়িয়াখানার মোড়ে নামলাম। সেখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে চিড়িয়াখানার কাউন্টারে এসে টিকিট কাটলাম। আমরা মোট নয়জন ছিলাম। চিড়িয়াখানায় ঢুকেই জলে কতকগুলো বালি হাঁস রাজহাঁস, সারস পাখি দেখলাম। তারপর কতকগুলো ভাল্লুক দেখলাম। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ ছোলা খাচ্ছে।

একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখলাম। সে রেগে গর্জন করছিল। তার জিভ দিয়ে জল পড়ছিল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল। তারপর জলহস্তী দেখলাম। জলহস্তীগুলো সব জলে ডুবে ছিল। তারপর শিম্পাঞ্জী দেখলাম। দুটো শিম্পাঞ্জী ছিল। আমাদের দেখে একটা শিম্পাঞ্জী ঘরে ঢুকে গেল। তাই দেখে আর একটা শিম্পাঞ্জী ঘরে ঢুকে গেল।

একটা হাতি দেখলাম। হাতিটা মাহুতের খুব বাধ্য। আমরা পয়সা দিতে গেলাম, হাতিটা নিল না। তখন মাহুত একরকম আঁকশি দিয়ে টেনে বলল, "পয়সা নাও।" হাতি তখন শুঁড় বাড়িয়ে দিল। আমরা শুঁড়ে পয়সা দিলাম। হাতি শুঁড়ে পয়সা নিয়ে মাহুতকে দিল। মাহুত বলল, "সেলাম কর।" শুনে হাতি সেলাম করল।

ভোঁদড় দেখলাম। ভোঁদড়টা দেখতে ছোট্ট। অনেকে তাকে পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছিল, সে জলের ভেতরে লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছিল। একটা গণ্ডার দেখলাম, সে সারা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর আমাদের কাছ থেকে খাবার চাইছিল। একটা রামগরু দেখলাম। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারপর পাখির খাঁচায় ময়ূর, কাকাতুয়া আর ম্যাকাও পাখি দেখলাম। ম্যাকাও পাখিটা লাফিয়ে এ ডাল থেকে ও ডালে যাচ্ছিল। আর, বলছিল 'হ্যালো মাই ডার্লিং'। আমিও বললাম 'হ্যালো মাই ডার্লিং'।

উত্তীয় জানা (বয়স ৮)

সুন্দরবন

গত বছর মা ও বাপির সঙ্গে বড়দিনের ছুটিতে সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ট্রেনে চড়ে ক্যানিং গেলাম। সেখান থেকে মাতলা নদী দিয়ে লন্‌চে করে গোসাবায় পৌঁছুলাম সন্ধ্যায়। সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে নৌকো করে সজনাখালির দিকে রওনা দিলাম, পথে একটা খুব চওড়া নদী পড়ল। নদীর জল নীল আর খুব নোনা। নদীতে অনেক শুশুক দেখলাম। এই নদীতে কুমীর ও হাঙর আছে। নদীর ওপারে ঘন বন, সেটাই সুন্দরবন। সজনাখালির বন অফিসে দুপুর বেলা পৌঁছলাম। খেয়ে দেয়ে আমরা পাখি দেখতে গেলাম নৌকো চড়ে। নৌকো চালাচ্ছিল অর্জুন বলে একটা লোক। অর্জুন একবার একজন লোককে বাঘের মুখ থেকে কেড়ে এনেছিল। খালের পাড়েই গভীর বন, ভাল করে কিছু দেখা যায় না। বন-অফিসের একটা ঘরে আমরা রাত কাটালাম। সকাল বেলা উঠে দেখি ঐ ঘরটার খুব কাছেই একটা গাছের গোড়ায় বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আমাদের কথা শুনছিল, আর বোধহয় আশা করেছিল আমরা ঘর থেকে বেরুলেই ধরবে।

কার্তিক শাসমল (বয়স ৭)।

বাঘের সঙ্গে

বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম গোসাবা। সেখান থেকে লন্‌চে করে সুন্দরবনে। এক জায়গায় লন্‌চ থামল, বাবা যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেমে পড়লাম। দুপাশে ঘুটঘুটে বন, মাথার ওপর নীল আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ ঘাস। এমন সময় হালুম! গোল-গোল চোখ, কালো হলুদ ডোরাকাটা বাঘ। দাঁত বের করে তেড়ে এল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি জিম করবেটের বন্ধু।' বাঘ বলল, 'সে আবার কে?' আমি বললাম, 'বাঘের বন্ধু।' আমি তখন আনন্দমেলা খুলে দেখালাম, বাঘটা তখন লজ্জা পেয়ে চলে গেল।

অর্জুনসারথি দাশগুপ্ত (বয়স ৬)।

সত্যিকারের ভূত

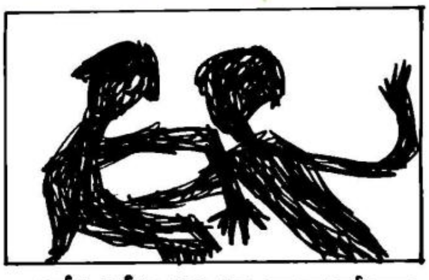

আমি একদিন একা একা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে একটা পোড়ো বাড়ি দেখতে পেলাম। আমি বাড়িটাতে ঢুকলাম। দেখলাম, কতগুলো ছায়া ঘোরাঘুরি করছে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দেখলাম, বাড়িতেও ছায়া পড়ছে। আমি ভূত মানে জানতাম না। আমি আমার হাতটা মুখের কাছে তুলে দেখলাম ছায়াটা হাত তুলছে না। তখন আমি বুঝতে পারলাম ওটা ভূত।

শুভাশিস সরকার (বয়স ৭)।

আমি

আমি একটি ছোট্ট মেয়ে ঝিমলি আমার নাম,,
যতই ছোট হই না কেন কম কি আমার দাম?
লিখতে জানি পড়তে জানি করতে জানি খেলা,
গানও আমি করতে জানি সকাল সন্ধেবেলা।

অনিন্দিতা সেন (বয়স ১১)

সফর

টাটা বাই বাই
চললাম ভাই টাটা,
টাটার থেকে রাঁচী হয়ে
যাব শেষে বাটা।
বাটায় আছে বাটা মাছ
কুড়িয়ে নেব বেশ,
তার পরেতে ফিরব বাড়ি
সফর করে শেষ।

ঈশিতা মিত্র (বয়স ১২)

পুতুলের বিয়েতে

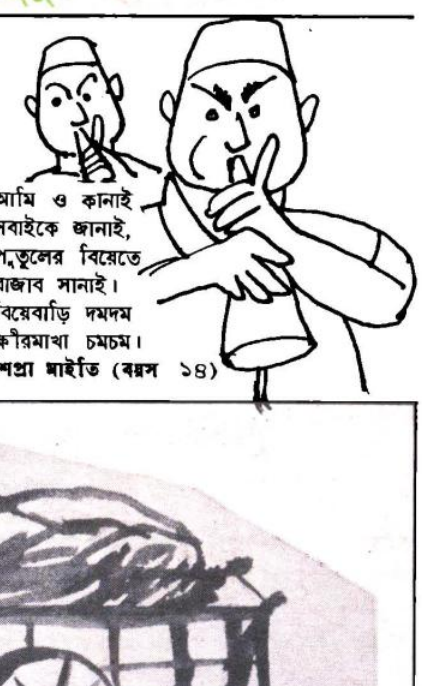

আমি ও কানাই
সবাইকে জানাই,
পুতুলের বিয়েতে
বাজাব সানাই।
বিয়েবাড়ি দমদম
ক্ষীরমাখা চমচম।

শিপ্রা মাইতি (বয়স ১৪)

ছবি এঁকেছে ধ্রুব ভট্টাচার্য

বাড়ির নীচে নদী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বাড়ীর নীচে নদী। নদীতে কানায়-কানায় জল। জলে বইছে স্রোত। আর স্রোতে ভাসছে একলা এক নৌকো। উঠছে ঢেউ। একলা নৌকো দুলছে দুলছে দুলছে।

না, না! একলা কেন? ওই তো দোকলা। নৌকোয় কিনা মাঝি, মাঝির হাতে বৈঠা। ঝুপঝুপ জলের তবলায় বাজনা বাজছে আর বাজছে। কালো নৌকোর কালো মাঝি চেরা গলায় গান ধরেছে সেই তালে। ঘাটে এক বটের গাছ। গাছের পাতা সেই গান শুনে থেকে-থেকে দিচ্ছে জোর হাততালি। আকাশে উড়ে যেতে যেতে এক ঝাঁক বুনো হাঁস বলে যায়—কেয়াবাত কেয়াবাত!

তাই শুনে কোত্থেকে এক নাড়াবুনে দলপিপি সানাইয়ের পোঁ ধরতে গেছে পিঁ পিঁ। আর সেই সময়ে এবাড়ির ছোট্ট ছেলেটা পিস্তলের গুলি ছুড়ে দিয়েছে ফট্ ফট্রাস্। ফট্ ফট্ ফট্রাস্! দলপিপি অমনি ভো কাট্টা।

ছেলেটার নাম অন্তু। তার হাফপেন্টুলে একটা লালচোখো ধড়িবাজ গাঙফড়িং বসে আছে চুপটি করে, যদি সে জানত! হুঁ, জানলে বড় সর্বনাশ! গাঙফড়িংটার লেজে সুতো বেঁধে দিত। আর তাই দেখে ভেরেণ্ডা গাছের প্রজাপতিটা হাসির চোটে এপাড়া ওপাড়া ছুটোছুটি করে বেড়াত। তো, এখন অন্তুর চোখ অন্যদিকে যে! দলপিপিটার সানাই থামতেই তার প্যাটপেটে চাউনি গেছে একলাদোকলা নৌকোর দিকে। আর বাতাস উজিয়ে ভেসে এসেছে মাঝির চেরা গলার গান।

(ভাইরে!) কে যাবি ওপারে আয়রে আয়রে আয়রে...
কেষ্টচরণ রয়েছে যখন ভয় নাইরে নাইরে নাইরে...

মাঝির নাম তাহলে কেষ্টচরণ! অন্তু ডাকে, "ও মাঝি-ভাই! ও কেষ্টচরণ! আমি ওপারে যাব-ও-ও-ও!"

তাই শুনে কেষ্টচরণ, উঁহু, সেই দোকলা নৌকো, তর-তর করে এগিয়ে আসে ঘাটের দিকে। নিরিবিলি সুনসান ঘাটের ধারে বটগাছ। গাছের একটা শুকনো ডালের গর্তে থাকে একটা পেঁচা। তার নাম হুতুমথুমো। তুম্বোপানা মুখ বের করে গম্ভীর গলায় বলে, "খবর্দার খবর্দার!

অন্তু বলে, "কে রে? বাগড়া দিচ্ছিস বড়?"

হুতুমথুমো ফের বলে, "খবর্দার খবর্দার!"

অন্তু পিস্তল তাক করেছে, ওদিকে নদীর ওপর দিয়ে

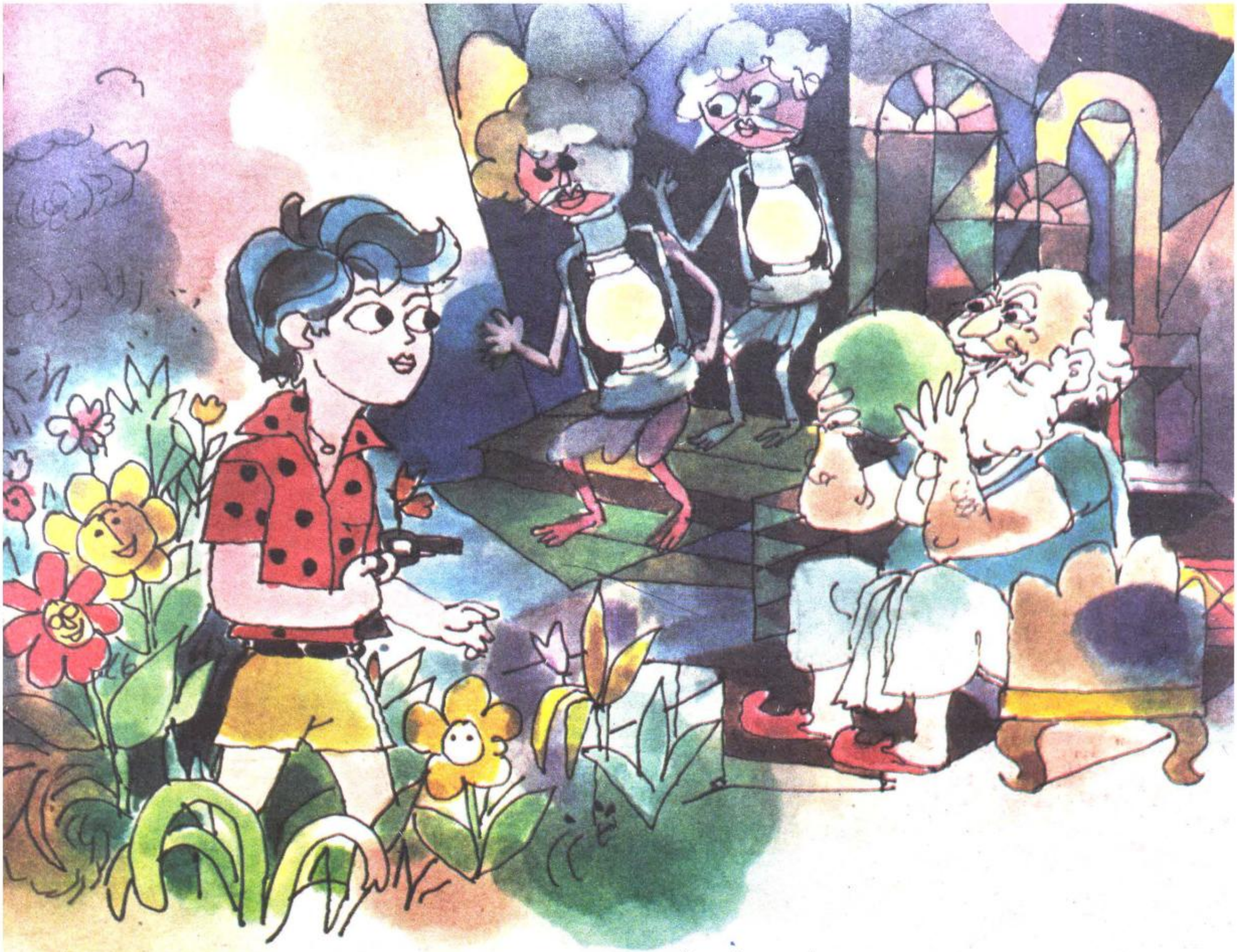

ওপার থেকে উড়ে এসেছে এক ঝাঁক কাক চেঁচাতে-চেঁচাতে। হুতুমথুমো অমনি গর্তে লুকিয়ে যায়। **ওরে বাবা! ওই** কুচুটে কাকের ভয়েই তো দিনমান লুকোচুরি। দেখলেই ঠুকরে মাথার চুল উপড়ে ন্যাড়া করে ফেলবে।

কিন্তু কাকগুলো যেন তাড়া খেয়েই পালিয়ে আসছে ওপার থেকে। **অন্তু মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলে, "কী হয়েছে, কী হয়েছে?** পালাচ্ছ কেন? ও কাকু! ও কাকা!"

তার জবাবে কাকগুলো শুধু বলে যায়, "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা! চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!"

এদিকে কেষ্টমাঝি নৌকো ভিড়িয়েছে ঘাটে। কালো মুখে সাদা-সাদা দাঁতের হাসি। সেই হাসি হেসে ডাকে, "কই গো খোকাবাবু! এসো।"

অন্তু দোনামনায় পড়ে যায়। কাক-কাকুরা পালিয়ে এল কেন? হুতুমথুমোই বা বলল কেন, খবর্দার, খবর্দার? আর মাঝির গায়ের রঙ যা কালো, ওকে বিশ্বাস করা যায় না যে! কে জানে ভূত না প্রেত। ভূতের গায়ের রঙ নাকি কুচকুচে কালো। সাদাসাদা দাঁতে ওইরকম হাসে।

অন্তু বলে, "ও মাঝি! ওপারে কী হয়েছে? কাকগুলো পালিয়ে এল কেন?"

কেষ্টমাঝি বলে, "ও কিছু না, ও কিছু না। পিঁপড়ে কামড়ে **দিয়েছে। ওপারের গাছগাছালিতে ডেয়ো পিঁপড়ের বাসা। ডিম** পেড়েছিল নিরানব্বুই লাখ। বাহান্নটা কাকের ভাগে কটা করে পড়ে, হিসেব করো না! সেই ডিম খেতে গিয়েই বিপদ বাধাল। **তুমি তো আর পিঁপড়ের ডিম খেতে যাচ্ছ না!"**

"রামোঃ! পিঁপড়ের ডিম খায় নাকি?" অন্তু থুথু ফেলে বলে।

কেষ্ট বলে, "চলে এসো, চলে এসো। আর দেরি কোরো না। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে যে!"

অন্তু ভাবতে-ভাবতে বলে, "যাব? বিপদ হবে না তো?"

কেষ্ট বেজায় হাসে। বলে, "বিপদ? কিসের বিপদ? তোমার আবার বিপদ? তোমার কিনা পিস্তল রয়েছে হাতে। বিপদ দেখলেই ফট্ ফট্টাস করে দেবে। ব্যাস! সব ব্যাটা বিপদ আপদ হয়ে যাবে।"

অন্তু এক লাফে উঠে বসেছে নৌকোয়। আর নৌকো চলেছে তরতর করে। জলের তবলায় বৈঠা তালে তালে বাজায় ঝুপঝুপ বাজনা। দেখতে-দেখতে এপারটা ঝাপসা হয়ে যায়। ঘাটের ধারে বট গাছটার জন্যে কে জানে কেন এতক্ষণে মন কেমন করে অন্তুর। **আর বাড়ি? দূর দূর! বাড়ি মানেই পড়াশোনা। পড়াশোনা মানেই ইস্কুল। ইস্কুল মানেই অঙ্কের স্যার! ছ্যা, ছ্যা!**

এদিকে কেষ্টমাঝি হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে।

(ভাই রে!) ওপারে যাই যাই রে!
মন করে খাই খাই রে!
যা পাই তাই খাই রে!
ধরে মুখে পুরে খাই রে!

সর্বনাশ! বলে কী ও! অন্তু ভয়ে-ভয়ে পিস্তলটা ধরে থাকে। ওদিকে নদীর ওপারে সূর্যি ডুবু-ডুবু। গাছগাছালির ঝিমধরা ভাব। পাখপাখালি তাড়াহুড়ো করে বাসার দিকে চলেছে। শুধু জলের ওপর বিতিকিচ্ছিরি মাকড়শাগুলো ট্যাঙস ট্যাঙস করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখেই যা ভরসা। অন্তু বলে, "ও মাঝিভাই, ও কী গান গাইছ তুমি?"

কেষ্টমাঝি দাঁত ছরকুটে বলে, "খাওয়ার গান খোকাবাবু। ওপারে পৌঁছুলেই দেখবে, তোমারও খাই-খাই বলে গান গাইতে ইচ্ছে করবে!"

অন্তু বলে, "কেন? ওপারে গেলে খুব খিদে পায় বুঝি?"

"হুঁউ! দেখছ না, ওপারের হাওয়া এসে পেটে খামচে ধরেছে! কী খিদে! কী খিদে! ইচ্ছে করছে, এই বৈঠাটা কামড়ে-কামড়ে খাই!"

বলেই না কেষ্টমাঝি বৈঠার গোড়াটা আখের মতো এক কামড়ে ভেঙে নিল। আর কুড়মুড় করে চিবুতে লাগল। চিবিয়ে খোসাগুলো ফেলে দিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে কত রকম মাছ এসে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি জুড়ে দিল।

তারপর কেষ্ট বলে, "ও খোকাবাবু, দেব ভেঙে খানিকটা? খুব রসালো কিন্তু!"

ওরে বাবা! বলে কী ও? শুকনো কাঠের বৈঠা রসালো! নদীর অন্য পারে যেতে না-যেতেই যে এমন বিদঘুটে ব্যাপার হবে, ভাবাই যায় না। অন্তু বলে, "না, না। আমার খিদে পায়নি।"

"পাবে, পাবে। ভেবো না।" বলে কেষ্টমাঝি আরেক কামড় খায়। আধখানা বৈঠা এবার বেতালে ওঠে আর পড়ে। পাড়ে নৌকো ঠেকতে-ঠেকতে গোটা বৈঠা চিবিয়ে খাওয়া হয়ে গেল। এক লাফে কেষ্টমাঝি পাড়ে নেমে তখন কাছি ধরেছে। "চলে এসো খোকাবাবু।"

অন্তু লাফ দিয়ে নামে। নামতেই দেখে কেষ্টমাঝি নৌকোর গলুই কামড়ে ধরেছে। সর্বনাশ! এ যে বেজায় খিদে। অন্তু এত ভয় পায় যে, তক্ষুনি আর পিছু না তাকিয়ে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়—দৌড় দৌড় দৌড়!...

নিঃঝুম নিরিবিলি এক বন। মানুষ নেই জন নেই, জন্তু নেই জানোয়ার নেই—খাঁ খাঁ। নদীর এপারটা এমন হবে কে জানত! পাখ নেই পাখালি নেই, ফড়িং নেই প্রজাপতি নেই, পোকা নেই মাকড় নেই, এ কেমন দেশ! তবে যে কেষ্টচরণ পিঁপড়েদের নিরানব্বুই লাখ ডিমের কথা বলছিল। লোকটা মহা ধড়িবাজ, মিথ্যুক! ব্যাটা ভূত না হলেও রাক্ষস। রাক্ষস না হলেও খোক্কস তো বটেই। ওই নৌকোখেকো খোক্কসের পাল্লায় পড়া উচিত হবে না। কিন্তু বাড়ি ফিরবে কেমন করে? অন্তু ভেবে ভেবে সারা। যেদিকে যায় বন আর বন।

এদিকে সন্ধেবেলার ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। কুয়াশার টুপি পরে নিয়েছে গাছপালা। একটু পরেই কিনা ঢ্যাঙা একটা শিমুল গাছ লম্বা-লম্বা হাত বাড়িয়ে আকাশে পিদিম জ্বালতে থাকে। তার মাথায় যেন ঘোমটা। যেন আড়চোখে তাকিয়ে অন্তুকে বলে, "ও খোকা, তোমার বাড়ি কোথায়?"

অন্তু ভয়ে-ভয়ে বলে, "নদীর ওপারে।"

আর খুব কাছ থেকে বেঁটে একটা ভুঁড়িওলা ভেরেন্ডাঝোপ যেন ফিসফিস করে বলে "আহা! ছেলেটা পথ হারিয়েছে!" পথ হারিয়েছে! পথ হারিয়েছে! প্রতিধ্বনি ছড়াতে থাকে ঝোপঝাড়ে।

আর টলতে টলতে আসে একটা মত্তমাতাল বাতাস। গায়ের ওপর পড়েই যেন জিভ কেটে বলে, "সরি!"

এপারের সবই যে বিদঘুটে তাতে ভুল নেই। অন্তু হাঁটতে থাকে, হাঁটতে থাকে। কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত! টুপি পরা গাছগুলো চাদর জড়ানো ঝোপগুলো আর মত্তমাতাল বাতাস-গুলো ঝটপট সরে তাকে রাস্তা দেয়। অন্তু কিনা স্পষ্ট শুনতে পায়, পিছনে ফিসফিস কানাকানি চলছে। বলাবলি হচ্ছে, "বাঁচা গেল, খুব বাঁচা গেল! এতকাল পরে ওপার থেকে একটা মানুষ এল!" কে বুঝি বলল, "তবে মানুষটা খুব ছোট্ট।" তাই শুনে অন্যেরা তেড়েমেড়ে বলল, "ছোট হোক খাটো হোক, বেঁটে হোক, লম্বা হোক, একটা মানুষ তো বটে! আহা, কতকাল আমরা মানুষ দেখিনি!"

একটু পরেই অন্তু উঠেছে চমকে। কখন এল এমন ঘুর-ঘুট্টি আঁধার! আর সেই মিশমিশে কালো আঁধারে দূরে ঝিকমিকোচ্ছে একটা পিদিম। উঁহু শিমুল বউটির জ্বেলে দেওয়া আকাশ পিদিম নয়। সামনে মাটির ওপর যাচ্ছে দেখা। তারপর কিনা দুলতে লেগেছে। দুলতে-দুলতে এদিকেই আসছে। ও হরি! এ যে আস্ত লণ্ঠন। লণ্ঠন যখন আসছে, তখন তার সঙ্গে মানুষও আছে। তবে যে ওরা বলছিল, এপারে মানুষ নেই?

সর্বনাশ! সর্বনাশ! মানুষ কোথায়? ঠিক বলেছিল ওরা। এ যে জ্বল-জ্যান্ত লণ্ঠন। তার মানে, জ্বলছেও বটে, জ্যান্তও বটে। দুখানা পা, দুখানা হাতও আছে। পেটটা জ্বলছে। বাঃ বাঃ! এ তো মন্দ নয়। এপারে সবই উল্টোপাল্টা তাহলে। অন্তু চেঁচিয়ে ডাকে, "লণ্ঠনদা! ও লণ্ঠনদা!"

লণ্ঠন দু পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে ওর মুখটা দেখে নেয়। তারপর একগাল হেসে বলে, "আরে এসো এসো! ওপার থেকে আসছ বুঝি? তা হ্যাঁ গো, ওনাদের খবর কী? সেই যে..."

অন্তু বলে, "কাদের কথা বলছ?"

লণ্ঠন চোখ নাচিয়ে বলে, "পোকারাম মাকড়চন্দ্রদের কথা জিজ্ঞেস করছি। কেমন আছে সব? গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ পাব তো? বুঝেছ তো? ওরা হচ্ছে আমার ভাগ্নে। আমি ওদের মামা।"

অন্তু খুশি হয়ে বলে, "তুমি ওপারে যাচ্ছ লণ্ঠন মামা? আমিও তোমার সঙ্গে যাব। খুব দেরি করে ফেললুম। স্যার এসে বসে থাকবেন।"

এই শুনে লণ্ঠন কেন কে জানে বেজার হয়ে গেল। গোমড়া মুখে বলল, "আমি বরাবর একা যাওয়া পছন্দ করি, বুঝেছ? চলি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। পোকারাম মাকড়চন্দ্র বাবাজীরা এতক্ষণ আমার জন্যে হা পিত্যেস করেছে। গেলেই মামা মামা বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে—আর বুঝেছ তো?"

বলে লণ্ঠন চোখে একটা বিদঘুটে ইশারা দিয়ে গটগট করে চলে গেল। অন্তু মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ঘুরঘুট্টে আঁধার। আবার সব কালো কালো কালো।

আর একটু পরেই মাথার ওপর কী শব্দ। অন্তু আঁতকে উঠে বলে, "কে রে?" বলেই তার মনে পড়ে যায়, হাতে কিনা গুলি-ভরা পিস্তল, আর সে বোকার মতো ভয়ে সারা হচ্ছে। ফট্ ফট্ ফট্টাস্! ফট্ ফট্ ফট্টাস্! দেয় সে গুলি চালিয়ে।

অমনি 'বাবারে! গেছি রে! উহু হু হু!' বলে ধুপ করে একটা কী তার সামনে পড়ে। অন্তু বলে, "কে, কে?"

কাঁদোকাঁদো স্বরে জবাব আসে, "আমি ডাব। বাবা আদর করে বলে ডাবু, মা বলে ডেবো।"

অন্তু অবাক হয়ে বলে, "আমি কিন্তু তোমায় ডাবদা বলে ডাকব।"

"হ্যাঁ খোকাবাবু, তাই বোলো। আমার বড়দার নাম নারকোল। ওইখানে ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেব? সে কিন্তু বড্ড রাগী।

খিটখিটে মেজাজ।"

অন্তুর মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। এতক্ষণে তেষ্টা পেয়ে গেছে কি না। সে বলে, "ডাবদা, কিছু মনে কোরো না। তোমার গায়ে গুলি লাগেনি তো?"

"লাগেনি আবার। মাথা ফুটে গেছে হয় তো। দেখে শুনে গুলি ছুঁড়বে তো!"

"ও ডাবদা, কোথায় তুমি? কাছে এসো তো, দেখি!"

"হুঁউ, কাছে যাই, আর ওই খোক্কস কেষ্টর মতন তুমি চোঁ চোঁ করে আমার পেটটা খালি করে দাও।"

"আহা, শোনোই না। আমি খোক্কস নই, মানুষ।"

"ওরে বাবা! মানুষ! সে আরও সাংঘাতিক যে!"

তারপর একটা শব্দ হল। অন্তু বুঝল শ্রীমান ডাব দৌড়ুচ্ছে। সে শব্দ ঠাহর করে দৌড়তে শুরু করল। তেষ্টাটা বেড়ে গেছে না? এই ধরে, ওই ধরে—পিছলে যায়। আবার খপ করে ধরে, পিছলে যায়। এই করতে-করতে কতদূর কত্তোদূর চলে গিয়ে হঠাৎ অন্তু দেখে, আবার একটা লণ্ঠন জ্বলছে। কিন্তু এ লণ্ঠনটা দুলছে না, চলছে না—স্থির। একটু এগিয়ে যেতেই আলোয় আলোময় একটা বাড়ি। আর তার দরজা দিয়ে ডাব ঠ্যাং দুটো নড়বড়িয়ে ঢুকে যায়। অন্তুও দৌড়ে গিয়ে ঢোকে।

দরজার পর উঠোন। উঠোনে ফুলের গাছ। আলো-আঁধারিতে খোকাখুকুরা যেন রঙীন জামাকাপড় পরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে সবাই—এসেছে! অন্তু এসেছে!

ব্যাপার কী? বিয়েবাড়ি, নাকি ইস্কুলের ফাংশান। সামনে বারান্দা। বারান্দায় দরজা। দরজার ওধারে ঘরের মেঝেয় বসে আছেন—সর্বনাশ! পাশের বাড়ির বিশুর ঠাকুর্দা যে! অন্ত বুঝতেই পারে না, এমন জায়গায় বিশুর ঠাকুর্দা কীভাবে এসে জুটলেন।

আর সেই ডাববেচারা যেমনি গেছে সামনে, খপ করে তার মুন্ডুটি ধরে বিশুর ঠাকুর্দা মুখে লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে দে টান দে টান! হুঁ বিশুর ঠাকুর্দা ডাব খেতে বড় ভালবাসতেন বটে। গোঁফদাড়ি গড়িয়ে অমনি করে জল ঝরত টুপ টাপ! হরদম চেঁচাতেন, "রুমাল কই? তোয়ালে কই?"

এদিকে অন্তু কাঠ। কাঠ না কাঠের পুতুল। এপারে সবই যে উল্টোপাল্টা। সে কাঁদো-কাঁদো মুখে তাকিয়ে আছে আর তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ বিশুর ঠাকুর্দার চোখ পড়ে এদিকে। লাফিয়ে ওঠেন। হাতের ডাব ছিটকে মেঝেয় পড়ে এবং বেচারা ডাব তক্ষুনি পড়ি-কি-মরি করে কোনার আলমারির তলায় গিয়ে লুকোয়। বিশুর ঠাকুর্দা বলেন, "কে রে ওটা?"

অন্তু ভয়ে-ভয়ে বলে, "আমি অন্তু।"

"অন্তু তুই? আয়, আয়। ওরে আয়!" বলে বিশুর ঠাকুর্দা ওর হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢোকান।

কী ঠান্ডা হাত! অন্তু ঝটপট হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায়। বলে, "তুমি যে কবে মরে গেছ!"

একগাল হেসে বিশুর ঠাকুর্দা বলেন, "মরলেই কি মরা হয় রে? আয়, আয়! আহা, কতদিন ভেবেছি—তুই যদি হুট করে এসে পড়িস, কী ভাল না হয়!"

অন্তু বলে, "যাঃ! তুমি তো মরে গেছ। তুমি ভূত।"

বিশুর ঠাকুর্দা জিভ কেটে বলেন, "ছিঃ! বলতে নেই! আয়, কাছে আয়।"

অন্তু আরও দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলে, "রামোঃ! মড়া ছুঁলে আবার চান করতে হবে না?"

বিশুর ঠাকুর্দা রেগে লাল হয়ে ওঠেন। "কী বললি, কী বললি? এই লণ্ঠনে! ওরে লণ্ঠনে! এদিকে আয় তো! ধরে নিয়ে আয় তো ছোঁড়াটাকে!"

অমনি তিনকোনা থেকে তিনটে বড় মেজো ছোট লণ্ঠন টেবিল থেকে নেমে আসে। হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে বিচ্ছিরি হাসে। আর অন্তু পিস্তল তুলে ঘোড়া টেপে। হায় রে হায়! আর একটাও গুলি নেই! তখন কী আর করে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলতে থাকে, "পোকা খাও মাকড় খাও! পোকা খাও মাকড় খাও!" তার বোন ঝিমি পড়তে বসে লণ্ঠনের সামনে এই মন্তরটা পড়ত কি না। সত্যি সত্যি তখন কিন্তু লণ্ঠনটা পোকা খেত, মাকড় খেত। আর সেগুলো গিলতে গিয়েই দপ করে নিভে যেত। তখন অন্ধকারে সে কী হাসি ঝিমির!

তা মন্তরটা কাজে লাগল। খুব কাজে লাগল। যেই না শোনা, তিনটে লণ্ঠন হাত ধরাধরি মার্চ করে চলল দরজার দিকে। তারপর 'খুব মনে পড়িয়ে দিয়েছে! খুব মনে পড়িয়ে দিয়েছে!' বলে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে বেরিয়ে গেল। ওরা যে নদীর ওপারে যাবে, তাতে ভুল নেই।

আর বিশুর ঠাকুর্দা অন্ধকার ঘরে দাপাদাপি জুড়ে দিলেন। "নেমকহারাম! বিশ্বাসঘাতক। সব্বাইর চাকরি খতম কর দেগা! বাড়িসে নিকাল দেগা!"

তারপর অন্ধকারে ধরে ফেলবেন ভেবে অন্তু যেই না দৌড়তে গেছে, তার ঠ্যাং ধরে টান দিল সেই ডাবটা। অন্তু আছাড় খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

অন্তু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

হুঁ, বাড়ির নীচে নদী। নদীতে কানায়-কানায় জল। জলে ঢেউ খেলছে। স্রোত বইছে। আর স্রোতে ভাসছে নৌকো। নৌকোয় আছে মাঝি। মাঝির হাতে ওটা কী? বৈঠা। বৈঠা জলে পড়েছে।

আর ঘাটের ধারে বটগাছ। তার ডালের গর্তে হুতুমথুমো প্যাঁচা।

আর নদীর আকাশে একঝাঁক কাক। নদীর জলে একটা দলপিঁপি।

আর ওগুলো কী? আকাশের কোনায়— হুঁ—এক ঝাঁক বুনো হাঁসই বটে। দূরে চলে গেছে।

আর নদীর ওপারে ঝাপসা বন।

অন্তু দুহাতে চোখ কচলায়। নদীর ওপারটা কী সাংঘাতিক। অন্তু কাঁদো-কাঁদো।

তাই দেখে নান্তু বলে, "কী হল রে অন্তু?" সন্তুও বলে, "কী হল রে অন্তু?" তারপর মা এসে বলেন,"হ্যাঁ রে, তোরা পড়বি না খালি গপ্প করবি?" তারপর অন্তুর কাছে এসে মিষ্টি হাসেন। "ও কী এঁকেছিস? বাঃ! দারুণ এঁকেছিস তো! দেখি, দেখি।" বলে মা করলেন কী, অন্তুদের বাবাকে ডাকলেন। "দেখে যাও, কেমন সুন্দর ছবি এঁকেছে অন্তু! বাড়ি এঁকেছে। বাড়ির নীচে নদী। নদীতে নৌকো। ও মা! নৌকোয় মাঝিও এঁকেছে আমার অন্তুছোনা!"

দূর! অন্তুর মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। কী সব গোলমেলে ব্যাপার!

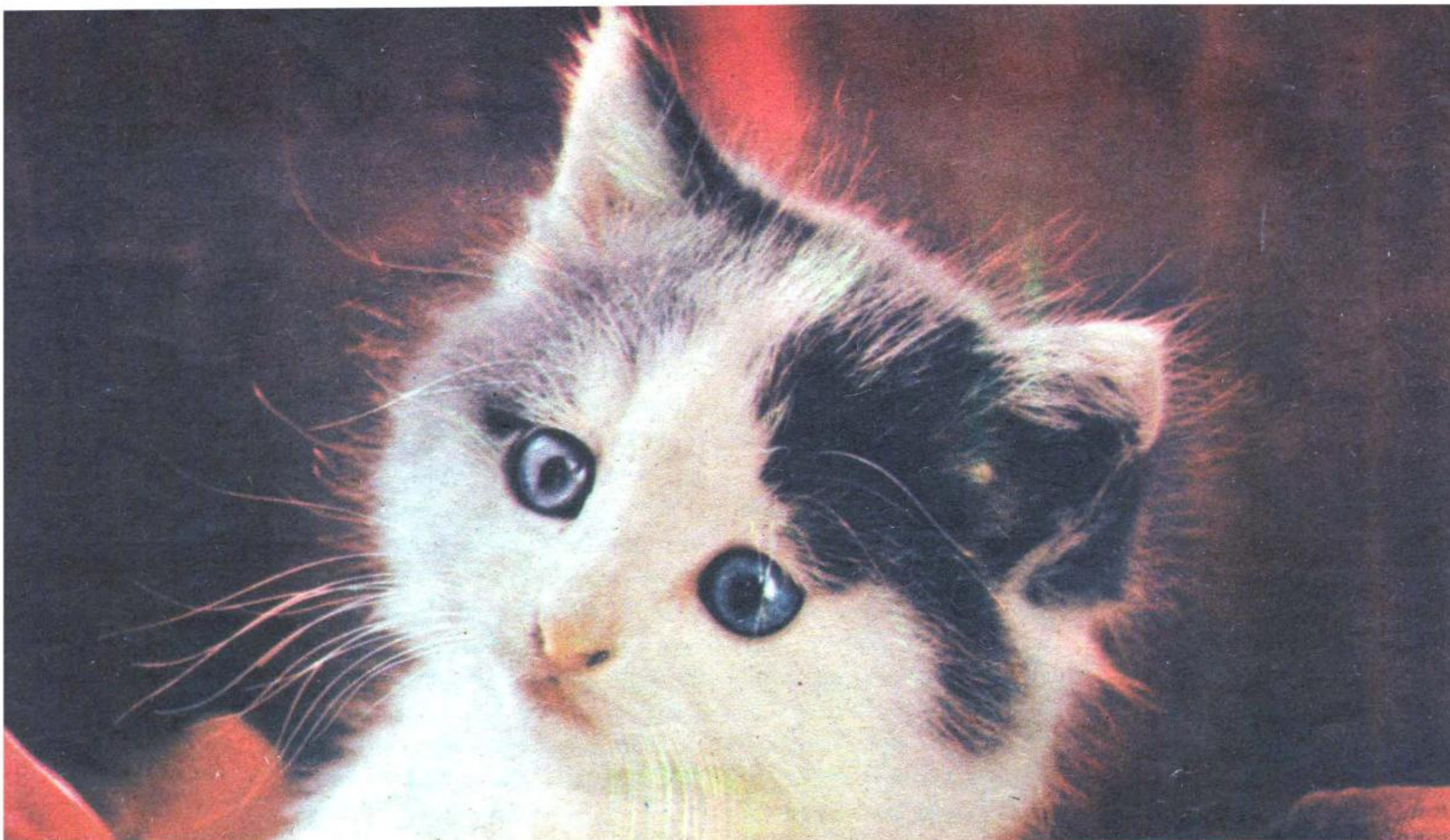

ও মা, শিগগির এসো, ছোট-ভাইটা উলের বলটাকে কীভাবে নষ্ট করছে, দেখে যাও

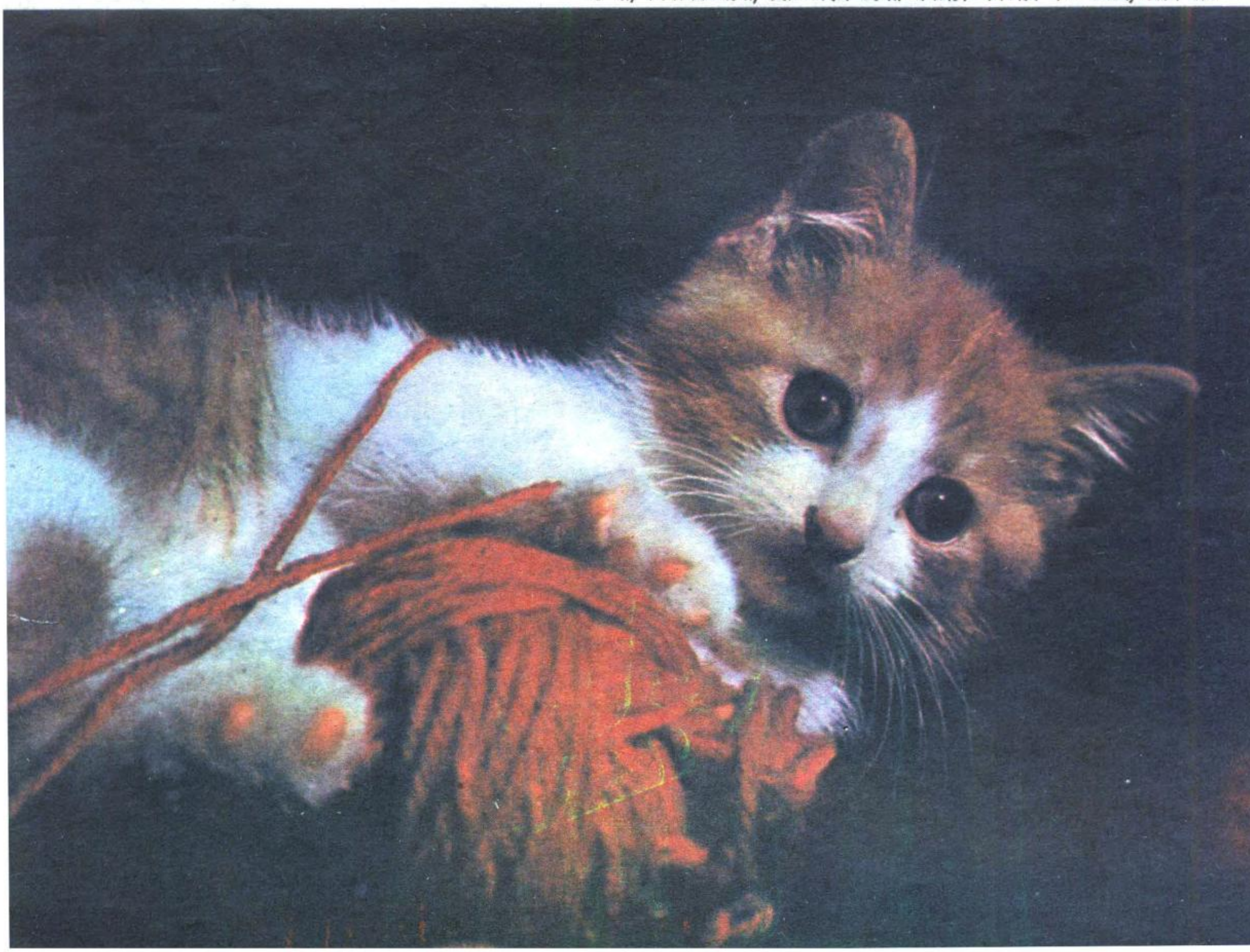

আমি তো খুব ছোট্ট, তাই নীচের ওই বেড়ালটার মতো একা-একা বাগানে গিয়ে খেলা করতে আমার ভয় করে

আটখানা

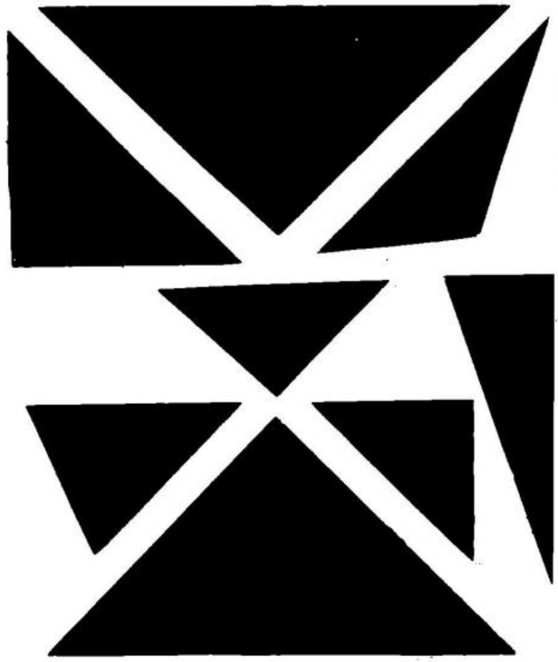

নতুন এই খেলাটির নাম আটখানা। শিখে নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হবার মতো খেলা এটি। চীন দেশের প্রাচীন এই খেলাটি এখন পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা অবশ্য সাত টুকরো দিয়ে খেলে। আমাদের খেলা আট টুকরো নিয়ে। ওপরে আটটা কালো টুকরো এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে। ওগুলো কেটে নিয়ে শক্ত বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগাও, তারপর ব্লেড দিয়ে ঠিক মাপ মতো কেটে নাও। হাতে তোমাদের এখন আটটা টুকরো। আটটা টুকরো এবার এমনভাবে সাজাও, যাতে এখানে-দেওয়া চৌকো মাপের ঘরটা একেবারে ভরে যায়। পরের সংখ্যায় সমাধান। সেইসঙ্গে পাবে আট-টুকরো দিয়ে বানানো নতুন নকশা। নকশা দেখে চেষ্টা করবে আট টুকরো দিয়ে সেটা বানাতে। নিজেরাও নতুন-নতুন নকশা বানাবে বই কী। নৌকো, পাখি, মানুষ, বেড়াল—অনেক-কিছু বানানো যায়। যাক, এখন তো আট টুকরো ঠিক মতো সাজিয়ে এই বর্গক্ষেত্রটি বানাও।

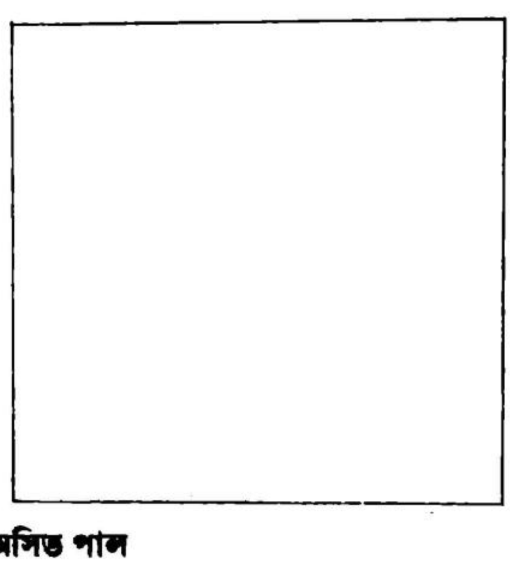

ধাঁধা

সেই সত্যবাদী আর মিথ্যেবাদীদের নিয়ে ধাঁধা অনেক শুনেছি। মানে বৃক্ষবাসী আর গুহাবাসীদের গোলমেলে কথাবার্তা। ছোট্কা হঠাৎ বলল, "কিন্তু এমনও তো অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা পুরোপুরি সত্যবাদী বা মিথ্যেবাদী নয়। কখনও সত্যি বলে, কখনও মিথ্যে। তাদের নিয়েই বেশী সমস্যায় পড়তে হয়।"

ছোট্কা যে নতুন ধরনের ধাঁধার কথা ভাবছে বুঝতে পারি। তাই কোনো উত্তর দিই না। একটা পুরনো ধাঁধা নিয়ে ছোট্কার কাছে এসেছিলাম, বৃক্ষবাসী আর গুহাবাসীদের ধাঁধা। কথায়-কথায় ছোট্কা দেখি অন্য দিকে সরে যাচ্ছে।

"বৃক্ষবাসী-গুহাবাসী বলব না।" ছোট্কা যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল, "পরিষ্কার সত্যবাদী আর- মিথ্যেবাদী। আর যারা কখনো সত্যি কখনো মিথ্যে বলে তাদের নাম দিতে পারি, মধ্যবাদী।

"ধরা যাক তিনজন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন সর্বদা সত্যি বলে, একজন সর্বদা মিথ্যে, আর-একজন কখনও সত্যি কখনও মিথ্যে। কে কোন্জন জানা নেই।" ছোট্কা বলে চলল, "প্রথম জনকে প্রশ্ন করা হল, মাঝখানের জন কে? উত্তরে প্রথমজন বলল, মাঝের জন সত্যবাদী।

"এবার মাঝখানের লোকটিকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কে? উত্তরে সে বলল, আমি মধ্যবাদী (অর্থাৎ যারা কখনো সত্যি কখনো মিথ্যে বলে)। এরপর শেষ লোকটির পালা। তাকেও প্রথমজনের মতোই প্রশ্ন করা হল, মাঝখানের লোকটি কে? শেষের জন বলল, মাঝখানের লোকটি মিথ্যেবাদী।

"এর থেকে বার করতে হবে, তিনজন লোকের মধ্যে আসলে কে কী। কে সত্যবাদী, কে মিথ্যেবাদী,

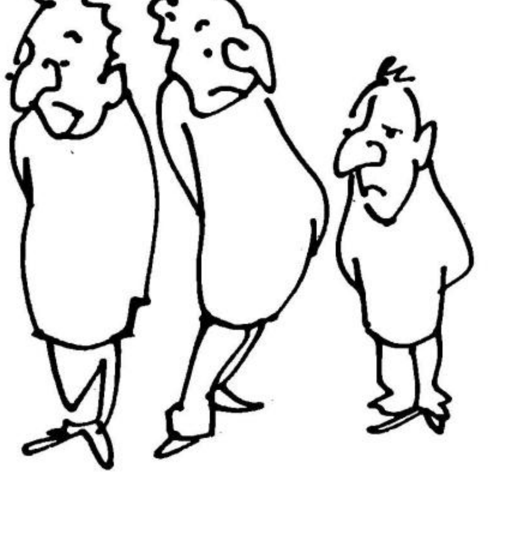

মধ্যবাদীই বা কোন্জন।" ছোট্কা আমার দিকে তাকাল। "কেমন ধাঁধা সতুবাবু?" আমি আর কী বলব। ছোট্কার সব ধাঁধাই দারুণ লাগে আমার, বিশেষ করে যখন উত্তর বলে দেয় ছোট্কা। উত্তরটাই আসল। সুতরাং সেটা তোমরা বার করে ফেল। এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা : তিন জাতের আম মিশে আছে একটা ঝুড়িতে। কটা আম তুললে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, এক-জাতের আম কম পক্ষে দুটো উঠবে? এক-জাতের আম কম পক্ষে তিনটি থাকে এমন ভাবে তুলতে গেলেই বা কটা আম তুলতে হবে?

তৃতীয় ধাঁধা : একদম খালি পেটে কটা রসগোল্লা খেতে পারো?

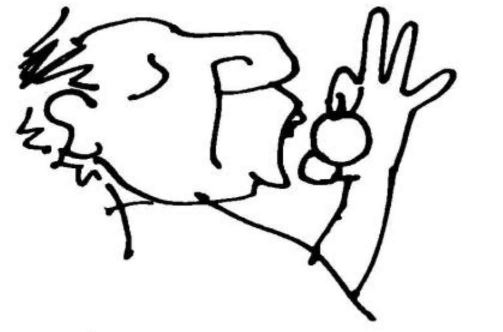

চতুর্থ ধাঁধা : দারুণ ঘুম-কাতুরে একজন লোক সকাল আটটায় ট্রেন ধরবে বলে সকাল সাতটায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখল ঘড়িতে। এমনিতে সে বারো-চোদ্দ ঘন্টা ঘুমোয়। তাই আগের দিন সন্ধে ছটায় শুয়ে পড়ল। শুয়েই ঘুম। পরের দিন সকাল সাতটায় ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে তার ঘুম ভাঙবে কি?

গতবারের উত্তর॥ (১) দুটো রুটি পাশাপাশি বসিয়ে এক পিঠ সেঁকে নিতে হবে প্রথমে। এতে সময় লাগবে দু-মিনিট। এবার দুটো এক-পিঠ-সেঁকা রুটির একটি নামিয়ে নেওয়া হবে। অন্য রুটিটি উল্টে দিয়ে তার পাশে নতুন রুটি রেখে আবার হিটার চালাতে হবে। দু-মিনিট বাদে একটি রুটির দু-পিঠ সেঁকা হয়ে যাবে, নতুন রুটিটিরও এক পিঠ সেঁকা হয়ে থাকবে। গেল চার মিনিট। এবার রইল দুটি এক-পিঠ করে সেঁকা রুটি। দু-মিনিটে রুটি দুটোর উল্টো পিঠ সেঁকে নেওয়া যাবে একই সঙ্গে। তাহলেই মোট ছ-মিনিটে তিন পিস পাউরুটি পুরো সেঁকা হয়ে গেল। (২) ন-জন ছেলেকে একটি করে কমলালেবু দিয়ে, দশ-নম্বরকে ঝুড়িশুদ্ধ লেবু দিলেই হল। প্রত্যেকে একটা করে পেল, ঝুড়িতে একটা রইল। (৩) মাঝরাত্তিরে বৃষ্টি হচ্ছে, ৭২ ঘন্টা পরেও তো আবার মাঝরাত। সুতরাং ৭২ ঘন্টা পরে রোদ্দুর ওঠার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে। (৪) আমার এখনকার বয়স ২৩, বাবার ৪৬।

সত্যসন্ধ

কিসের ফটো

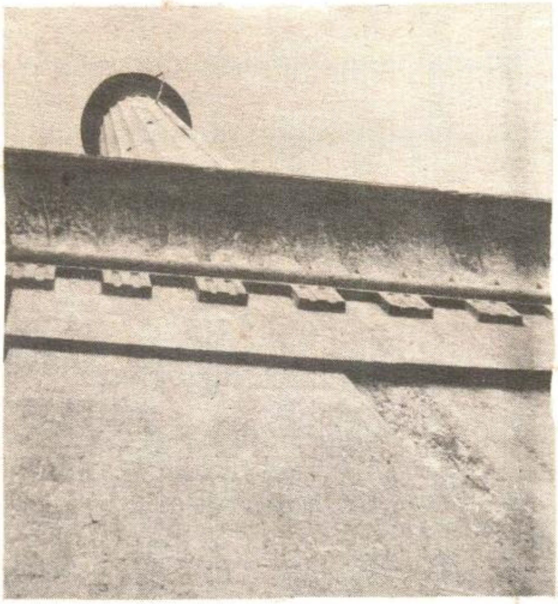

উত্তর আগামী সংখ্যায় / ছবি তুলেছেন তপন দাশ

গতবারে ছিল টেবিলে-রাখা চশমার ছবি

কিসের ছবি

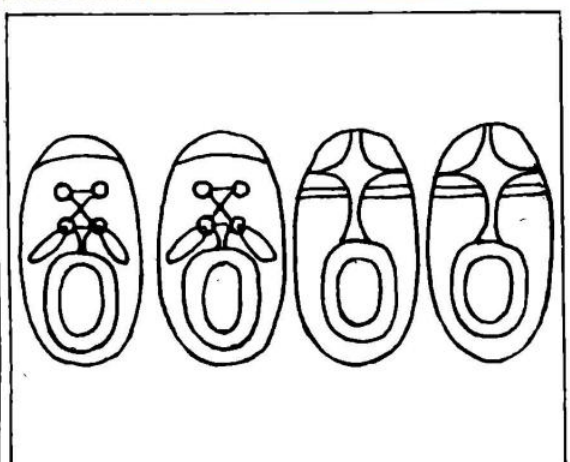

এ ছবিটা দেখে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন পর-পর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে একসঙ্গে গান গাইছে, অথবা একসঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়েছে! এদের শুধু মাথা দেখা যাচ্ছে. শরীরের বাকি অংশ গেল কোথায়? এদের কারও কিন্তু ধড় নেই. এরা ধড় ছাড়াই চলছে. ফিরছে. ঘুরছে। তবে কখনোই একা নয়. দুজন করে ঘোরে। আর. তোমাদের কারও সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না। তোমাদের সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি. কিন্তু আগেই বলে নিচ্ছি. পরিচয় জানার পরে কিন্তু ওদের মতো হা-হা করে হাসবে না। তোমরা বাড়িতে যেখানে সবাই জুতো ছেড়ে সারি-সারি সাজিয়ে রাখো সেখানেই একটু দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখবে যে, তোমাদেরই জুতোগুলো অমন হা-হা করে হাসছে, কখনো বা একসঙ্গে গলা ছেড়ে গান ধরছে!

শব্দ-সন্ধান

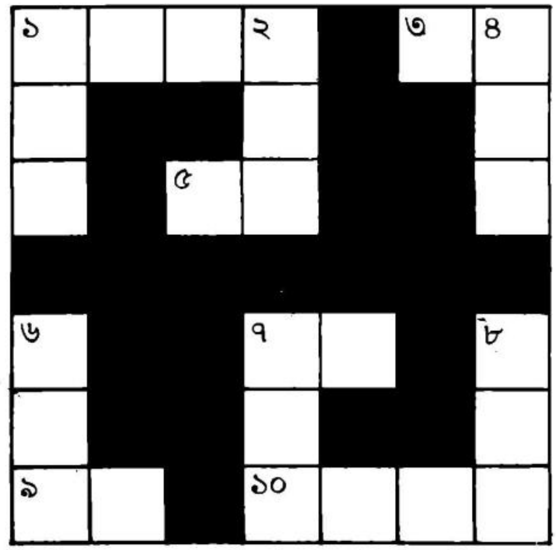

এবারের শব্দ-সন্ধান তোমাদের রামায়ণজ্ঞানটা ঝালিয়ে নেবার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। রামায়ণের বারোটি চরিত্র—তা সে নর-বানর যক্ষরক্ষ যা-ই হোক না কেন—পেয়ে যাবে এই ছকগুলোর মধ্যে। শুধু সূত্র অনুযায়ী পূরণ করার যা অপেক্ষা!

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দুজনের নাম একই সঙ্গে করে লোকে। (৩) নামের অর্থ—যার জন্ম নেই। কিন্তু না জন্মালে মরলেন কী করে।! (৫) জনস্থানের যে-সব রাক্ষস মুনিদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলত, এ তাদের পালের গোদা। (৭) মায়াবী আর দুন্দুভি দৈত্যকে বধ করেছিলেন কে? (৯) রঘুর প্রপৌত্র। (১০) চার যুগেই যাঁরা অমর তাঁদের একজন।

উপর-নীচ : (১) এমন অসুর, যাকে না হলে রান্নাই হয় না। (২) অসুরের নামে এক জাতের হরিণকেও বোঝায়। (৪) রাজা নিজেও জমি চাষ করতেন। (৬) তিন-মাথাওয়ালা এক রাক্ষস। (৭) শীর্ষাসনে রাবণের বাবা। (৮) কুবেরের সৎ ভাই।

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

গতবারের সমাধান

১ ক	র	বী		২ চ	ম্প	৩ ক
দ						ম
৪ ম	ল্লি	কা		৫ ব	কু	ল
৬ গো	লা	৭ প		৮ শি	উ	লি
		লা		মু		
	৯ কা	শ		১০ ল	বে	

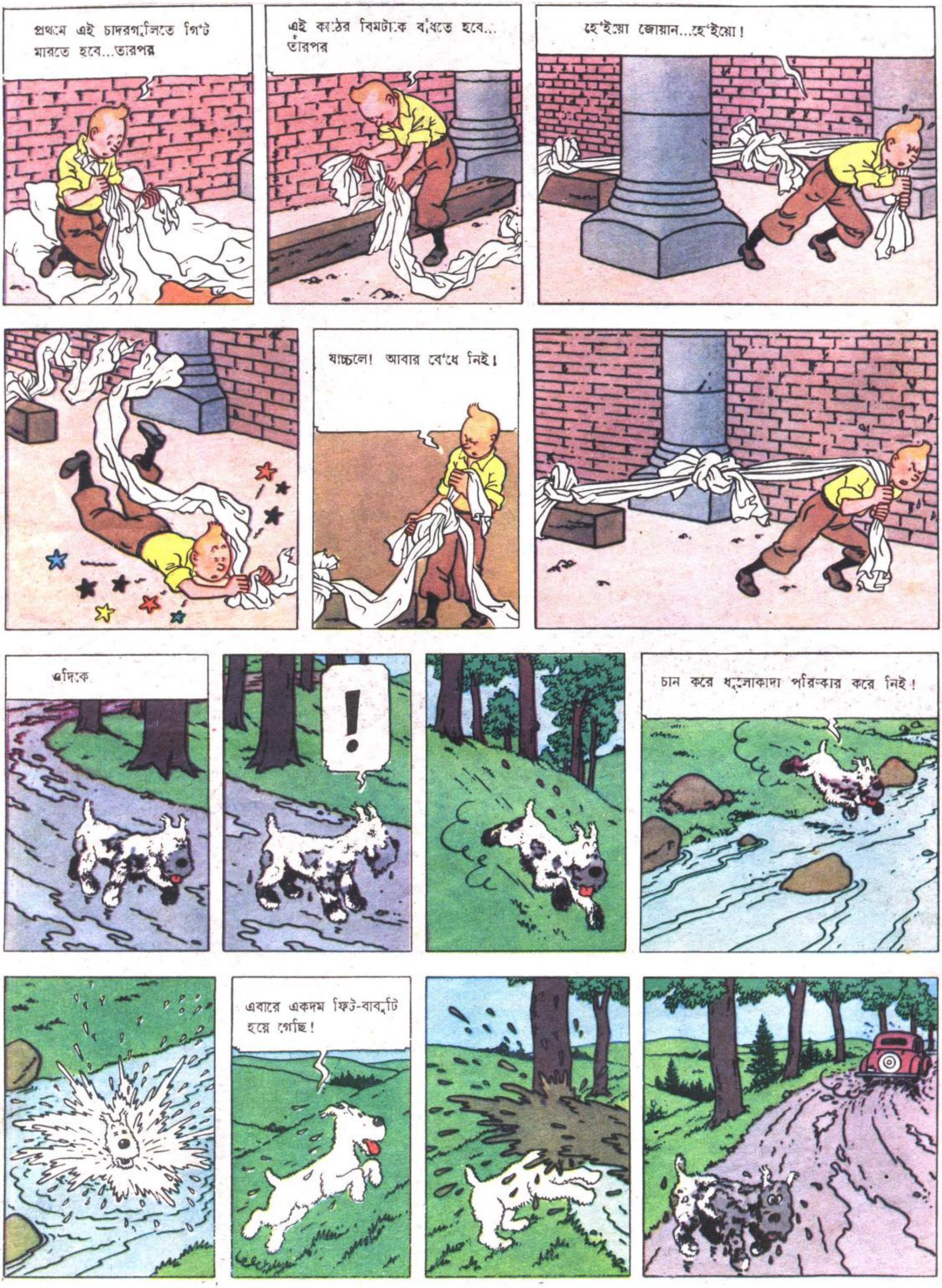
প্রথমে এই চাদরগুলিতে গিঁট মারতে হবে...তারপর
এই কাঠের বিমটাকে বাঁধতে হবে... তারপর
হেঁইয়ো জোয়ান...হেঁইয়ো!
যাচ্চলে! আবার বেঁধে নিই।
ওদিকে
!
চান করে ধুলোকাদা পরিস্কার করে নিই!
এবারে একদম ফিট-বাবুটি হয়ে গেছি!

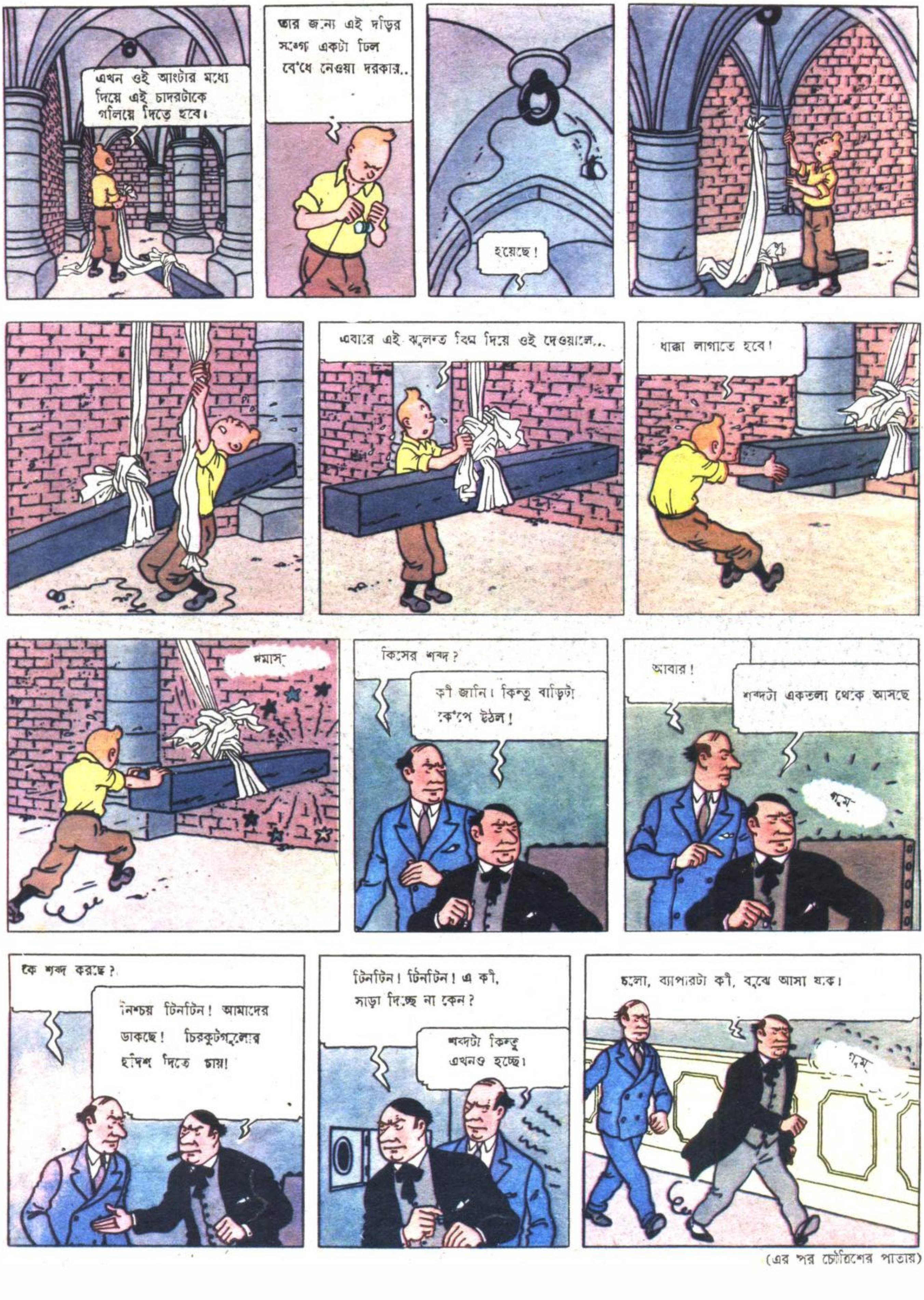

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

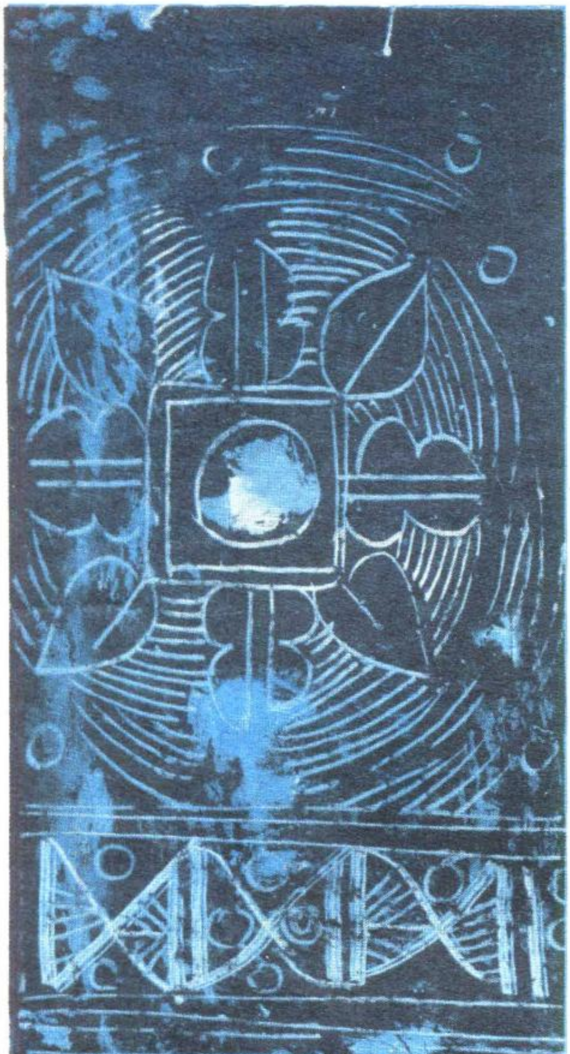

আপনা থেকে ছবি

এবার ছবি এ'কে দেখিয়েছি রং দিয়ে।

ছবি শুরু করার আগে কিন্তু ছবির জমি তৈরি করে নাও। যে-ছবি আঁকতে চাও, তা অয়েল বা মোম প্যাস্টেল দিয়ে করো। ছবি শেষ হলে তার ওপর কালো পোস্টার-রং মাখিয়ে ঢেকে দাও। ভয় নেই, রং শুকিয়ে গেলে যে কোন ছুঁচলো জিনিস দিয়ে তোমার ঐ কালো কাগজের ওপর আঁচড় কাটলেই দেখবে তোমার ছবি আপনা থেকেই বের হয়ে আসছে, যা দেখতে লাগবে দারুণ। শুরু করে দিয়ে দেখই না কত আনন্দ আর মজা।

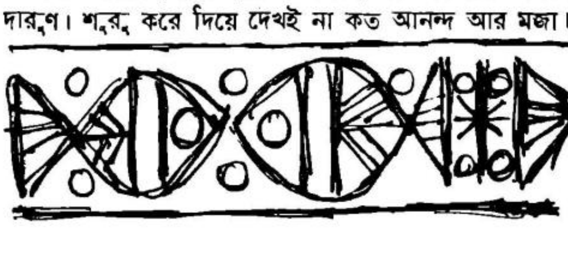

শেখো

কারিগর

স্টেনসিলের ছাপ কাজ

এবার শেখো একই কাজের বারবার ছাপ নেওয়ার নতুন ধরন। কাজ শুরু করার আগে জোগাড় করো—কাগজ, মোমবাতির মোম, ব্লেড, নরুন বা পাতলা ছুরি, নানান রং, তুলি আর কাপড়ের টুকরো।

শুরু করো। তোমার মনের মত নক্‌শা বা ছবির ছক করে নাও। মনে রেখো, এমন ভাবে নকশা বা ছবির কাজ করবে যাতে প্রত্যেকটি আকার একে অপরের সঙ্গে একটু ছুঁয়ে থাকে। এই বিশেষ দিকের নজর রাখতে হয় একটি রঙের ছাপের সময়।

যেখানে-যেখানে তোমার নক্‌শায় বাদ যাবে, তা আগেই ঠিক করে রাখো এখানে-দেওয়া নমুনার মতো। এবার মূল কাজের একটি নকল করে নিয়ে, একটা পাতলা টিন বা অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনা আগুনে তাতিয়ে নিয়ে—তোমার নকশার কাগজ তার ওপর রেখে সাবধানে মোমবাতির মোমটি চেপে বোলাতে থাকলেই মোম সারা কাগজের গায়ে ছড়িয়ে পড়বে। এবার তুমি তা গরম পাত্র থেকে নামিয়ে একটু সময় দিয়ে, নকশায় যে অংশগুলো বাদ দিয়েছ তা ব্লেড বা নরুন দিয়ে বাদ দাও। এবার তোমার খুশিমতো রং দিয়ে সুন্দর কাগজে ঐ কাটা নকশা রেখে তুলি বা কাপড়ের টুকরো রঙে ভিজিয়ে ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেই নীচের কাগজে ঝক্‌মকে নকশা ফুটে উঠবে।

জেনে রাখো। (১) সমস্ত কাগজ মোমে ভিজিয়ে নিলে জল রং দিয়ে ছাপ নিলে মূল কাগজ নষ্ট হয়না। (২) ছাপ নেবার সময় রং হালকা-গাঢ় করে লাগালে ছবির বাহার হয়। (৩) ব্লেড বা নরুন দিয়ে কাটবার সময় নীচে বোর্ড বা কাচ রাখলে টেবিল নষ্ট হবে না। (৪) তুলিতে বা কাপড়ে খুব বেশী রং নিও না। মাখা-মাখা রং নেবে। (৫) টিন বা অ্যালুমিনিয়মের পাত্র খুব গরম করবে না, আর সাবধানে ধরবে অন্য কিছু দিয়ে, হাতে নয়।

লাল নীল ঝাঁকে ঝাঁকে একোয়ারিয়ামে থাকে

বুঝতেই পারছ কাদের কথা বলছি। মাছ। সেই সব খুদে মাছ, যাদের খেলাধুলো-দৌড়ঝাঁপের জগৎ একটা কাচের বাক্সের মধ্যে। তারা অবশ্য জানে না, ওটা একটা বাক্স। সম্ভবত ভাবে, আছে অতল সমুদ্রে। কতরকম নুড়ি পাথর আর শ্যাওলার সঙ্গে বুদ্‌বুদ-বুদ্‌বুদ করে তাদের গল্প-গুজব। আর কী রঙ এক-একজনের। কেউ যেন রাঙা সূর্য-মামাটি। কেউ যেন বনের নীল অপরাজিতা। কেউ সোনার আংটিটির মতো। কেউ রুপোর ঝুমকো-দুলটির মত। কেউ আবার মাছের রাজ্যের প্রজাপতিটি। কার না ইচ্ছে করে এই রকম একটা-আধটা মাছ নিজের কাছে রাখতে সব সময়? রাখা যায় নাকি? নিশ্চয়ই যায়। নিয়ে এসো একটা চারকোনা কাগজ। ছক দেখে-দেখে ভাঁজ করে যাও। দেখবে একটা জলজ্যান্ত জলের মাছ, তোমার হাতের মুঠোয়।

পূর্ণেন্দু পত্রী

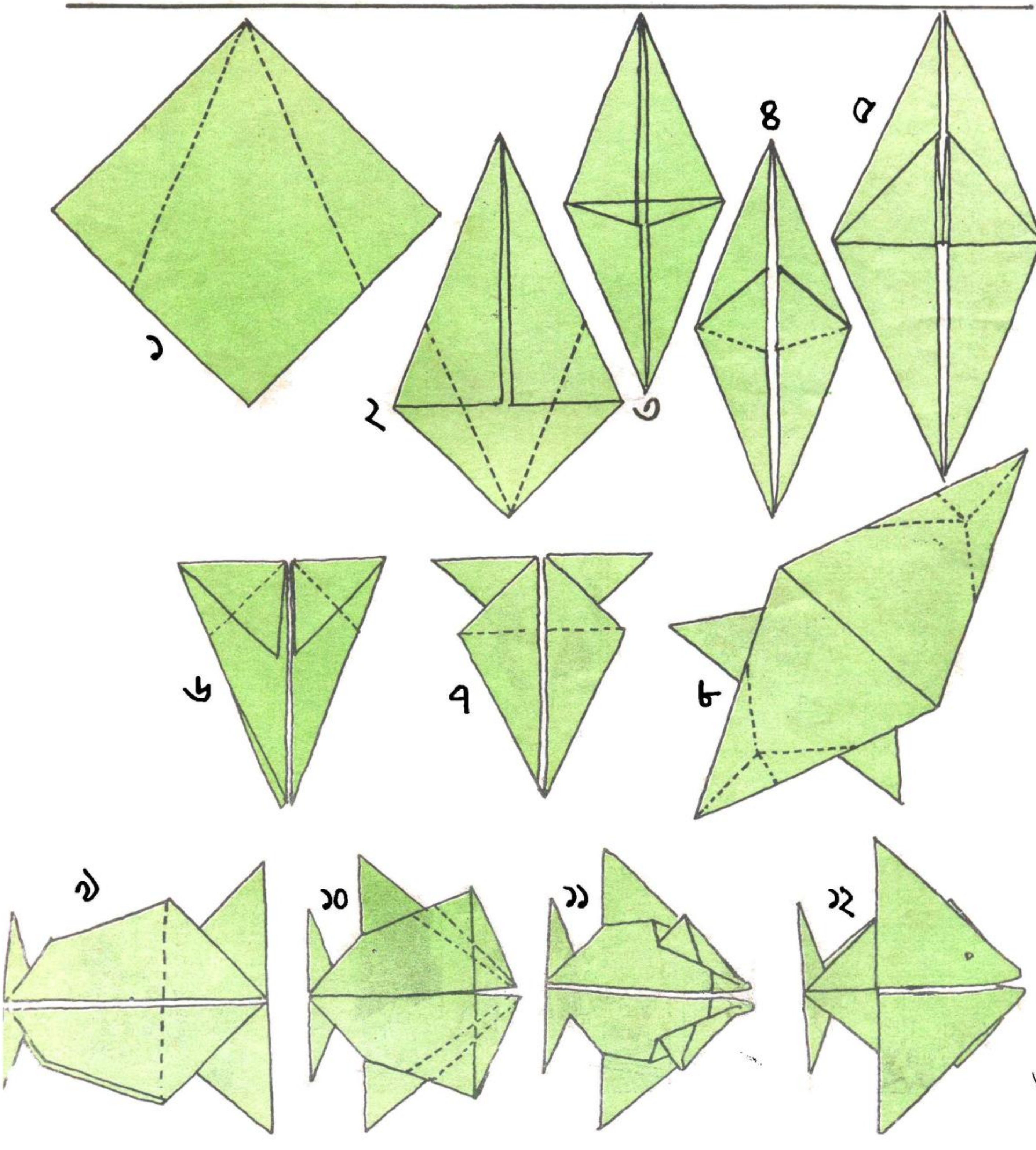

হ্যাঁ, নীচতলার থেকেই শব্দটা আসছে বটে
আর-একবার মারলেই দেওয়ালটা ধসে যাবে!
ধসেছে!
CR
ঝড়াং
?
!?
যাচ্চলে! এ যে একটা বাজনা-বাক্স: ইঁটগুলো ওরই উপরে পড়েছে
ওই তো!
?
দেখেছ? দেওয়ালটা ধসিয়ে দিয়ে পালাচ্ছে!
থাম! থাম! পালাল!
কোথায় টিনটিন?
এই জাদুঘরের মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে।
খুঁজে বার করতে হবে!
আরে বর্মটা নড়ে উঠল কেন?
!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

'ভয়ংকর সুন্দর' উপন্যাসের সেই সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন আন্দামানে। এর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা আন্দামানে এসে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবারেও ও'রা দেখেছিলেন কয়েকটি সাহেবকে মোটরবোটে চেপে পালাতে। এখানে একটা দ্বীপের জঙ্গলের মধ্যে জারোয়া নামে খুব হিংস্র আদিবাসীরা থাকে, বাইরের লোক দেখলেই তারা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মারে। আন্দামানে এসে পরেশ দাশগুপ্ত নামে একজন লোকের সঙ্গে সন্তু আর কাকাবাবু মোটর বোটে চেপে সমুদ্রে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ কাকাবাবু জোর করে একটা দ্বীপে নেমে পড়েন। সন্তুও চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে। সেই দ্বীপটাই জারোয়াদের। রাত্তিরবেলা ও'রা দেখতে পান, সেই সাহেবগুলোর সঙ্গে জারোয়াদের যুদ্ধ চলছে। শেষ পর্যন্ত সাহেবরা হেরে গিয়ে বন্দী হয়। খানিকটা পরে ঘুরতে ঘুরতে ও'রা হাজির হন একটা অদ্ভুত জায়গায়। সেখানে একটা গোলমতন জিনিস থেকে নানারকম আগুন বেরুচ্ছে। সেই আগুন ঘিরে বসে আছে শত শত জারোয়া। আর তাদের মাঝখানে সাদা-চুল-দাড়িওয়ালা এক থুত্থুরে বুড়ো। সে-ই জারোয়াদের রাজা। রাজার নির্দেশে এক-একজন বন্দী সাহেবকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আগুনের মধ্যে। রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সেখানে হাজির হলেন কাকাবাবু, সেই বুড়ো রাজার বুকের কাছে রিভলবার তুলে দাঁড়ালেন। বুড়ো রাজা কথা বললেন পরিষ্কার বাংলায়। জানা গেল, তিনি একজন বাঙালী বিপ্লবী, বহুকাল আগে আন্দামান জেল থেকে পালিয়েছিলেন। কথাবার্তার সময় একটু অন্যমনস্ক হতেই সাহেবরা বাঁধন ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াল, গুলি ছুঁড়তে লাগল। বুড়ো রাজা আর কাকাবাবুকেও তারা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, এই সময় আকাশে দেখা গেল একটা হেলিকপটার। সন্তুদের উদ্ধারের জন্য আসছে। সাহেবদের নেতা হাতে একটা মেশিনগান নিয়ে দাঁড়াল, হেলিকপটারটা নেমে এলেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। আর কোনো আশা নেই। তখন সন্তু মাটিতে-পড়ে-থাকা কাকাবাবুর রিভলবারটা তুলে নিয়ে গুলি চালিয়ে দিল সাহেবদের নেতার দিকে। সে মাটিতে পড়ে যেতেই কাকাবাবু মেশিনগানটা তুলে নিলেন। তারপর—

১৪

ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ করে হেলিকপটারটা ঘুরতে লাগল ওদের মাথার ওপরে। একটু একটু করে নীচে নেমে আসছে। অনেকটা কাছে আসার পর সেটা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। কে যেন মাইকে বলছে, "আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা! আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা!"

সন্তু অবাক হয়ে গেল। এ আবার কী?

সেই আওয়াজ শুনে জারোয়ারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "টাকিলা! টাকিলা!"

হেলিকপটার থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল, "কাকিনা সুপি সুপি! কাকিনা সুপি সুপি!"

এবার জারোয়ারা কোনো উত্তর দিল না। সবাই বুড়ো রাজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কী বলছে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ জিনিসটা থেকে কেউ একজন জারোয়া ভাষায় বলছে, মাঝখানে জায়গা ছেড়ে দিতে। ওটা এখানে নামবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাইকে আপনি সরে যেতে বলুন। জায়গা করে দিতে বলুন!"

এবার হেলিকপটার থেকে ইংরিজিতে কেউ জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার? মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার?"

কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, "ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার। রায়চৌধুরী স্পিকিং—"

কিন্তু হেলিকপটারের ঘ্যাটঘ্যাট আওয়াজে তাঁর কথা বোধ-হয় ওপরে পৌঁছল না, কারণ, ওরা সেই কথাই বারবার বলে যেতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের দিকে মেশিনগান তুলে রেখে, চোখ না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, তোমার পকেটে রুমাল আছে?"

রিভলবার থেকে গুলি চালাবার পর সন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে মাটিতেই বসে ছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, "হ্যাঁ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই রুমালটা বার করে মাথার ওপরে ওড়াতে থাকো।"

সন্তু তার সাদা রুমালটা বার করে ডান হাতে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের হুকুম করলেন, "তোমরা সব মাটিতে বসে পড়ো। প্রত্যেকে হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে রাখো।"

একজন সাহেব মাটিতে পড়ে থাকা একটা বন্দুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, একটু নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব!"

হেলিকপটারটা আস্তে-আস্তে ফাঁকা জায়গাটায় এসে নামল। প্রথমেই তার থেকে বেরিয়ে এল ধপধপে সাদা দাড়ি-ওয়ালা একজন শিখ। সে হাত তুলে বলল, "টুংচা সংচু! টুংচা সংচু!"

বুড়ো রাজা বললেন, "টুংচা সংচু!"

সঙ্গে-সঙ্গে সব জারোয়া সেই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বৃদ্ধ শিখটি তখন হেলিকপটারের দিকে হাত নাড়তেই তার থেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন।

প্রথমেই লম্বা চেহারার কৌশিক ভার্মা, তারপর বেঁটে গোলগাল পরেশ দাশগুপ্ত, তারপর বিশাল গোঁফওয়ালা

পুলিশের এস পি মিঃ সিং আর চারজন সৈন্য, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান।

পরেশ দাশগুপ্ত ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লাফাতে-লাফাতে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বেঁচে আছেন! আঃ, কী যে আনন্দ হচ্ছে! এই দেখুন, হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা নিজে এসেছেন আপনাকে উদ্ধার করতে।"

কাকাবাবুর আনন্দ হলেও মুখে তা প্রকাশ করেন না। কৌশিক ভার্মাকে দেখে তিনি বললেন, "আপনার সোলজারদের বলুন, এই সাহেবগুলোকে ঘিরে ফেলতে। আমি আর এই ভারী মেশিনগানটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এরা কারা?"

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "এরা ডাকাত!"

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "জারোয়াদের মধ্যে ডাকাতি করতে এসেছে? কিসের লোভে? এদের কাছে কি সোনা আছে? হীরে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে সব কিছু নেই। কিন্তু এইটা আছে।"

কাকাবাবু সেই রঙিন আগুনটার দিকে হাত দেখালেন।

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। এই সময় আগুনের রং বদলে যায়। এই আগুনটার রং কিন্তু একইরকম আছে।

কৌশিক ভার্মা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "আশ্চর্য! এরকম আগুন কখনো দেখিনি। সাহেবরা এটা চুরি করতে এসেছিল? এটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "সে সব পরে বলব। আপনি জারোয়াদের দ্বীপে এসেছেন, আগে এখানকার রাজাকে নমস্কার করুন! ইনিই জারোয়াদের রাজা!"

হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বুড়ো রাজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কৌশিক ভার্মা আরও অবাক হয়ে বললেন, "ইনি রাজা? মাই গড! ইনি তো জারোয়া নন?"

কৌশিক ভার্মা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন বুড়ো রাজাকে।

কাকাবাবু বললেন, "না, ইনি জারোয়া নন। এঁর নাম গুণদা তালুকদার।"

বুড়ো রাজা আস্তে আস্তে বললেন, "সাহেবগুলোকে ভালো করে বেঁধে ফেলতে বলুন। এরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আপনারা চলুন, আমার ঘরে বসে কথা বলা যাক।"

কাকাবাবু পরেশ দাশগুপ্তর কাঁধে ভর দিয়ে বুড়ো রাজার কুঁড়েঘরেরর দিকে এগোলেন। বুড়ো রাজা যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সন্তুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

সন্তু কাছে যেতেই বুড়ো রাজা তার মাথায় খুব স্নেহের সঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন, তারপর কৌশিক ভার্মাকে বললেন, "এই ছেলেটি না-থাকলে আজ আমরা কেউ বাঁচতুম না। আপনারাও বাঁচতেন না।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তাই নাকি? কেন? এ কী করেছে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ একজন সাহেবের হাতে মেশিনগান ছিল, সে গুলি চালিয়ে আপনাদের ঐ ফড়িঙের মতন যন্ত্রটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারত।"

বুড়ো রাজা আগে কখনো হেলিকপটার দেখেননি, তাই

শিশুদের—
কিশোরদের—
যত ছোটদের বই

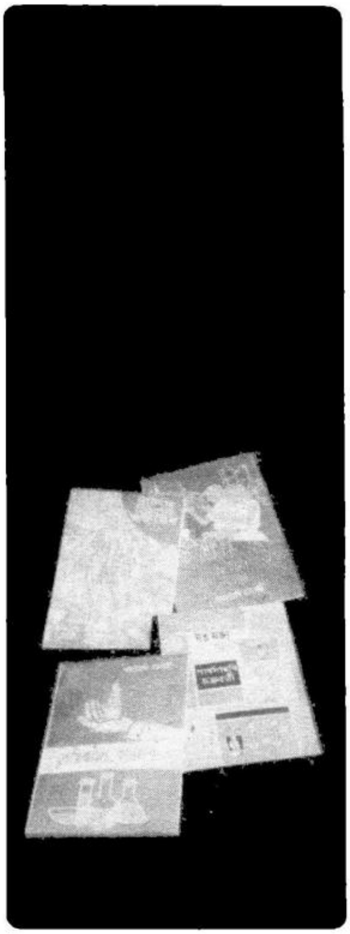

বিজ্ঞানের নানা বিষয় সরস ও আকর্ষক করে ছোটদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে পার্থসারথি চক্রবর্তীর জুড়ী খুঁজে পাওয়া ভার। বিজ্ঞানের অত্যন্ত নীরস ব্যাপার-স্যাপারগুলোও তাঁর লেখার গুণে ম্যাজিকের মতো বা মজার খেলার মতো পরম আগ্রহ ও কৌতূহলের বস্তু হয়ে ওঠে তাঁর ছোট্ট পাঠকদের কাছে। তাঁর বইগুলি রহস্যকাহিনী, গোয়েন্দা-উপন্যাস বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের চেয়ে কোনও অংশেই কম আকর্ষক নয় কিশোর-কিশোরীদের কাছে। তাঁর কয়েকটি নাম-করা বই :

কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্কি ৩.০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫.০০

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫ ০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ২.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০
শরৎ-কথামালা ১০.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

নাম জানেন না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তা হয়তো পারত। সাহেবগুলো মেশিনগান নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতি?"

বুড়ো রাজা বললেন, "সাহেবগুলো আমাকে আর ওর কাকাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সময় এই ছেলেটি রিভলবারের গুলি চালিয়ে সাহেবটির হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দেয়। তাই তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।"

কৌশিক ভার্মা প্রশংসার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ব্রেভ বয়! এইটুকু ছেলে রিভলবার চালাতে জানে? টিপও নিশ্চয়ই খুব ভাল।"

সন্তু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে তো এমন কিছু করেনি। আনতাবড়ি একবার রিভলবার চালিয়ে দিয়েছে। সে যে এর আগে কখনো রিভলবার চালায়নি সে কথা আর বলল না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "হি মাস্ট গেট আ রিওয়ার্ড। আমরা শুধু জারোয়াদেরই ভয় পেয়েছিলাম, সাহেব ডাকাতদের কথা ভাবিনি। সত্যিই সাংঘাতিক কিছু একটা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

কথা বলতে-বলতে ও'রা ঢুকলেন কুড়ে ঘরের মধ্যে। সেখানে সেই গীতা বইটি আর বহুকালের পুরনো একজোড়া হাতকড়া দেখে কৌশিক ভার্মা আবার চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমরা জানতাম, সভ্য জগতের সঙ্গে জারোয়াদের কোনো সম্পর্কই নেই, অথচ দেখছি, তাদের রাজা একজন লেখাপড়া-জানা মানুষ!"

কাকাবাবু মাটির ওপরে বসে পড়েছেন। সেখান থেকে তিনি বললেন, "এই গুণদা তালুকদার এক সময় ছিলেন একজন নামকরা বিপ্লবী। আন্দামান জেল থেকে ইনি পালিয়ে যান। সে বহু-বহু বছর আগেকার কথা। সকলের ধারণা ইনি মারা গেছেন। স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রত্যেক বইতে এ'র নাম আছে, ছবি আছে। এ'র জন্মদিনে উৎসব হয়।"

কৌশিক ভার্মা বললেনে, "হ্যাঁ, এখন আমারও মনে পড়েছে। এ যে দারুণ ব্যাপার। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে এই খবর দিলে তো বিরাট হৈচৈ পড়ে যাবে! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "এই হাতকড়ি বাঁধা অবস্থাতেই জেল থেকে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাঙরে কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু খায়নি। ভাসতে-ভাসতে এসে ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে।"

"জারোয়ারা আপনাকে মারেনি?"

"জারোয়ারা এমনি-এমনি কাউকে মারে না। এরা অত্যন্ত সভ্য। তোমরাই এদের হিংস্র বানিয়েছ।"

"তারপর থেকে আপনি এখানে থেকে গেলেন?"

"হ্যাঁ। আমি পরাধীন ভারতবর্ষে থাকব না ঠিক করেছিলাম, তাই এখানে এদের নিয়ে স্বাধীন হয়ে থেকেছি। আমি আর বাইরের কোনো খবর রাখিনি।"

"এই আন্দামানে তো নেতাজী এসেছিলেন, কিছুদিনের জন্য স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তাও জানেন না?"

"এই দ্বীপের বাইরের কোনো খবরই আমি রাখি না। ইচ্ছে করেই রাখতে চাইনি। আমি যে এখানে আছি, তা জানতে পারলেই ইংরেজ সরকার আবার আমাকে বন্দী করত। সুভাষবাবু যে কবে নেতাজী হলেন, একটু আগে পর্যন্ত তাও জানতাম না।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! কিন্তু গোটা ভারতবর্ষই তো অনেক দিন স্বাধীন হয়ে গেছে! আপনি সে খবরও পাননি?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি সে-কথাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। শুনুন, এই কৌশিক ভার্মা, ইনি গভর্নমেণ্টের একজন বড় অফিসার। এ'কে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সেই সাতচল্লিশ সালে। আপনি জওহরলাল নেহরুর নাম শুনেছিলেন তো?"

বুড়ো রাজা বললেন, "হ্যাঁ। মতিলাল নেহরুর ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল।"

"সেই জওহরলাল হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। সে-ও তিরিশ বছর আগে।"

"গান্ধী কোথায়?"

গান্ধীজী মারা গেছেন স্বাধীনতার এক বছর পরে। আপনাদের সময়কার প্রায় কেউ-ই বেঁচে নেই। চলুন, আপনি দিল্লি চলুন, সেখানে গিয়ে সব শুনবেন।"

বুড়ো রাজা ভুরু তুলে বললেন, "কোথায় যাব? দিল্লি? কেন? আমি কোথাও যাব না—"

"সে কী, আপনি এখনো এখানে থাকতে চান?"

"নিশ্চয়ই! আমি এখানে জারোয়াদের নিয়ে পরম শান্তিতে আছি।"

"আপনি স্বাধীন দেশে একবার ঘুরে আসতেও চান না? আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন হয়তো এখনো বেঁচে আছে, তাদেরও দেখতে চান না একবার?"

"না।"

বুড়ো রাজা কিছুতেই তাঁর জারোয়া-রাজ্য ছেড়ে আর যেতে চান না কোথাও। কাকাবাবু আর কৌশিক ভার্মা অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। শেষে একবার রেগে উঠে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে যেতে চান, সেটা আলাদা কথা। তবুও সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জোর করে নিতে গেলে সব জারোয়া এক সঙ্গে মিলে বাধা দেবে। তারা প্রাণ দিয়েও আমাকে বাঁচাতে চাইবে।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "না, না, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব কেন? আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। আপনি দেশ স্বাধীন করার জন্য এত কষ্ট করেছেন। কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে যখন আপনার কথা বলব, কেউ বিশ্বাস করবে না!"

সন্তু হঠাৎ বলে উঠল, "ছবি তুলে নিয়ে গেলে সবাই বিশ্বাস করবে।"

কাকাবাবু রাগ করে সন্তুর দিকে তাকালেন, সন্তু থতমত

টারজান আসছে

তোমরা অনেকেই টেলিফোন করে ও চিঠি লিখে জানতে চেয়েছ যে, টারজান কেন নিখোঁজ। আসলে, টারজানের ছবি বিদেশ থেকে আসে তো; আসতে দেরি হচ্ছে বলেই আমরা ছাপতে পারছি না। ছবিগুলি এসে পৌঁছবামাত্র আমরা আবার ছাপতে শুরু করব। তোমরা তো মাসিক আনন্দমেলাকে দারুণ ভালবাসো, তাই একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

খেয়ে গেল। সে বুঝতে পারেনি, সে ভুল কথা বলে ফেলেছে।

সাদা দাড়িওয়ালা প্রীতম্ সিং এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন, "কেয়া তাজ্জব কি বাত্! আমি এতদিন জারোয়াদের সংগে কথা বলেছি, কোনোদিন তারা জানতেও দেয়নি যে, তাদের একজন বাংগালী রাজা আছে। সেইজন্যই তারা বেশী ভেতরে ঢুকতে দিত না।"

বুড়ো রাজা বললেন, "সেটাই ছিল আমার হুকুম।"

কাকাবাবু হতাশ ভাবে বললেন, "তা হলে আপনি কিছুতেই যাবেন না?"

বুড়ো রাজা বললেন, "না।"

সন্তু কিছু না বুঝে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো রাজার হাত ধরে বলল, "আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে! একবারটি গিয়ে সব দেখে শুনে আবার এখানে ফিরে আসবেন। জানেন, হাওড়া স্টেশনে মাটির তলা দিয়ে রাস্তা হয়েছে, আপনি তো সেসব দেখেননি!"

বুড়ো রাজা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে, তুই আমাকে একথা বললি কেন? তোর মতন আমার একটা ছোট ভাই ছিল, জেলে আসবার আগে তাকে ঠিক এই বয়েসী দেখে এসেছি। তোকে দেখেই তার কথা মনে পড়ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আপনার সেই ভাই এখনো বেঁচে আছেন। আপনি গেলে তাকে দেখতে পাবেন!"

বুড়ো রাজা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, "ঠিক আছে, আমি যাব! কিন্তু তার আগে তোমাদের কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে!"

কাকাবাবু আগ্রহের সংগে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন!"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমাদের কথা দিতে হবে, আমার এই জারোয়াদের কেউ কোনো ক্ষতি করবে না। এই দ্বীপে অন্য কেউ আসতে পারবে না। জারোয়াদের ঐ পবিত্র আগুন তোমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ওরা যে-রকম ভাবে বাঁচতে চায়, সেইরকম ভাবে থাকতে দেবে।"

কাকাবাবু তাকালেন কৌশিক ভার্মার দিকে।

কৌশিক ভার্মা সংগে সংগে বললেন, "আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, এগুলো সব মানা হবে। এগুলোই তো আমাদের নীতি।"

বুড়ো রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে চলো, কিন্তু কয়েকদিন থেকেই আমি আবার ফিরে আসব কিন্তু!"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

বাইরে প্রত্যেকটি সাহেবের হাত পিঠের দিকে মুড়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সন্তু যে সাহেবটিকে গুলি করেছিল, সেও মরেনি, দুটো গুলিই লেগেছে তার কাঁধে। হেলিকপটারে কিছু ওষুধপত্র ছিল, তাই দিয়ে তাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের পাহারায় সাহেবদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের দিকে। ওখান থেকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের।

বাকিরা সবাই হেলিকপটারে যাবে।

কিন্তু বুড়ো রাজাকে হেলিকপটারে তোলার সময় সে একটা দৃশ্য হল বটে। বুড়ো রাজা জারোয়াদের ভাষায় বুঝিয়ে বললেন ওঁর চলে যাবার কথা। সংগে সংগে প্রত্যেকটি জারোয়া মাটিতে মুখ গুঁজে একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করতে লাগল। এই ওদের কান্না। কান্নার সময় ওরা কারুকে মুখ দেখায় না। কয়েকটি জারোয়া মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বুড়ো রাজাকে। তারা কিছুতেই ওঁকে যেতে দেবে না। তিনি হাত-পা নেড়ে অনেক কষ্টে ওদের বোঝাতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ছে। তিনি মাটিতে মুখ-গোঁজা প্রত্যেকটি জারোয়ার গায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি ফিরে আসব, ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব!"

কৌশিক ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, "মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসতে পারে, আগে কখনো দেখিনি। এদের ভালবাসা কত আন্তরিক!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ!"

তারপর এক সময় হেলিকপটার আকাশে উড়ল। সমস্ত জারোয়া একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, বুড়ো রাজাও হাত নাড়তে লাগলেন তাদের দিকে। একটু বাদেই হেলিকপটার চলে এল সমুদ্রের ওপর।

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না। দূর থেকেই দেখা যায় জেলখানাটা। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সেলুলার জেল। পোর্ট ব্লেয়ারে এখনো সেটাই সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। আকাশ থেকে সেদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো রাজা। একদিন তিনি এই জেল থেকে পালিয়েছিলেন। আজ সত্যিই সেখানে রাজার মতন ফিরে আসছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে থাকা হল মাত্র একদিন। এর মধ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতা আর দিল্লিতে। ঠিক হল,

কলকাতায় প্রথমে তিনি তিনদিন থাকবেন। তারপর যাবেন দিল্লিতে। সেখানে যে ক'দিন তাঁর থাকতে ইচ্ছে হয় তিনি থাকবেন। তারপর যেদিন ফিরে আসতে চাইবেন, সেদিন আবার কলকাতা হয়ে ফিরবেন।

পরদিন বিশেষ বিমান ও'দের নিয়ে এল কলকাতায়। দমদম এয়ারপোর্টে কী সাংঘাতিক ভিড়। হাজার হাজার মানুষ এসেছে জারোয়াদের রাজাকে দেখতে। আরও কত খবরের কাগজের লোক, ফটোগ্রাফার। আলোর ঝিলিক দিয়ে ফটো উঠছে ঘন ঘন। সন্তুরও ছবি উঠে যাচ্ছে খুব, কারণ বুড়ো রাজা তারই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিনা।

মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠছে, "গুণদা তালুকদার জিন্দাবাদ!"

এয়ারপোর্টে সন্তুর মা-বাবা, দুই দাদা, পাশের বাড়ির রিনি, বাবলু, পিংকুরাও এসেছে, কিন্তু সন্তু তো এক্ষুনি বাড়ি যাবে না। বুড়ো রাজার সঙ্গে এখন তাদেরও যেতে হবে রাজভবনে, সেখানে গভর্নর তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজ খাওয়াবেন। লাটসাহেবের বাড়ি খাওয়া তো যে-সে কথা নয়।

লোকেরা এত ফুলের মালা দিচ্ছেন যে, তার ভারেই আরও ঝুঁকে পড়ছেন বুড়ো রাজা। এত ভিড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট হবে বলে কৌশিক ভার্মা তাড়াতাড়ি তাঁকে গাড়িতে তুললেন। কাকাবাবু আর সন্তুও সেই গাড়িতে।

গাড়ি এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। আবার কলকাতায় ফিরে সন্তুর খুব আনন্দ হচ্ছে। এবার যে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে তাতেই খুব সন্দেহ ছিল।

সন্তু বুড়ো রাজাকে বলল, "জানেন তো, এই রাস্তাটার নাম ভি আই পি রোড। আপনাদের সময় তো এটা ছিল না।"

বুড়ো রাজা কোনো উত্তর দিলেন না।

কাকাবাবু বললেন, "তখন এসব জায়গাতেও জঙ্গল ছিল।"

গাড়ি চলতে লাগল, আর সন্তু নানান রকম খবর দিতে লাগল বুড়ো রাজাকে। এটা বিধান রায়ের মূর্তি, ঐ যে ঐখানে শিশু উদ্যান, এই জায়গাটার নাম কাঁকুরগাছি...

বুড়ো রাজা একটাও কথা বলছেন না।

গাড়ি মানিকতলা পেরিয়ে যখন বিবেকানন্দ রোড দিয়ে ছুটছে সেই সময় বুড়ো রাজা হঠাৎ "উঃ" শব্দ করে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

কৌশিক ভার্মা ও কাকাবাবু দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন "কী হল? কী হল?"

বুড়ো রাজা উত্তর না দিয়ে 'আঃ আঃ' শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এ কী! উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনেই আমার এক বন্ধুর ডাক্তার-খানা। ঐ যে ল্যাম্পপোস্টের পাশে—ওখানে গাড়ি থামান!"

কাকাবাবুর বন্ধু ডাক্তার, সামনেই তিনি বসে আছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে বুড়ো রাজাকে ভেতরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

ডাক্তারের ওষুধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরল বুড়ো রাজার। ডাক্তারবাবু বললেন, "ও'কে এক্ষুনি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না—"

কাকাবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনার কষ্ট হচ্ছে? হাসপাতালে গেলেই ভাল হয়ে যাবেন। এখন কলকাতায় ভাল ভাল হাসপাতাল আছে।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!"

"ফিরে যাবেন? হ্যাঁ, যাবেন, কয়েকদিন পরে—"

বুড়ো রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "না, এক্ষুনি! তোমাদের এখানে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না! এখানকার বাতাস এত খারাপ, এখানে এত শব্দ, এত মানুষ, এত বাড়ি... আমার সহ্য হচ্ছে না...রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম মানুষ ভিক্ষে করছে, রোগা রোগা ছেলে, না না, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো..."

কাকাবাবু কিছু বলতে গেলেন, তার আগেই দু'বার হেঁচকি তুললেন বুড়ো রাজা। অতি কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, "আমি পারছি না। এখানে থাকতে পারছি না. নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এত ধুলো এখানকার বাতাসে, এত শব্দ..."

বুড়ো রাজা জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে আবার শুইয়ে দিলেন তাকে। বুড়ো রাজার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে আপন মনে বলতে লাগলেন, "আমি কেন এলাম! কত ভাল জায়গায় ছিলাম আমি...সেখানে বাতাস কত টাটকা ...পাখির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, আর ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই, সেখানে কেউ ভিক্ষে করে না, সেখানে কত শান্তি, সেই তো আমার স্বর্গ! কেন এলাম, আমাকে নিয়ে চলো।...এক্ষুনি এক্ষুনি...আমি যাব...আঃ!"

হঠাৎ বুড়ো রাজার কথা থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সকলের মুখগুলোও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, উনি কি..."

কাকাবাবু কিছু উত্তর দিলেন না। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। সন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল, কাকাবাবুর চোখে জল।

সেও আর সামলাতে পারল না। শব্দ করে কেঁদে উঠল।

(শেষ)

বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসুর
দারুণ রোমাঞ্চকর উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

কমলা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন

রবীন্দ্রসরোবরের শান্ত বাতাসের স্নিগ্ধ ছোঁয়া অবিরাম এসে লাগছে লেক রোড এক্সটেনশনের কমলা গার্লস্ স্কুলে। বুঝি বা মায়ের সস্নেহ স্পর্শের মতই। দক্ষিণ কলকাতার এই স্কুলটি সম্পর্কে 'কেউ স্ট্যান্ড করবে কিনা' এ-প্রশ্ন আজকাল শোনা যায় না। যেন স্ট্যান্ড না-করাটাই অস্বাভাবিক। ফার্স্ট ডিভিশন প্রচুর, স্কলারশিপের ছড়াছড়ি। পাশের হার প্রত্যেক বছরই শতকরা একশো।

প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা ঘোষকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার মেয়েরা ঠিক কী রকম উত্তর লেখে যে প্রতি-বারই এত সুন্দর ফল করে?"

তিনি বললেন, "উত্তর শুধু নির্ভুল আর যথাযথ হওয়াটাই ভালো নম্বর পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উত্তরের একটা নিজস্বতা থাকা চাই। উত্তর পড়ে পরীক্ষক যেন এ-ধারণা করেন যে, পরীক্ষার্থীর চিন্তাধারা বল্গাহীন নয়, সুশৃংখল। আর তার প্রকাশভঙ্গি আড়ষ্ট নয়, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। আর একটা দরকারী কথা হল, একটা প্রশ্নের অনেক দিক থাকতে পারে। একটি প্রথম শ্রেণীর উত্তরে ঐসব বিভিন্ন দিক নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"

আমি বললাম, "মনে করুন, প্রশ্ন এল, '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল' লেখো। এর উত্তর ঠিক কী রকম হলে পরীক্ষক হিসেবে আপনি ভাল নম্বর দিতে দ্বিধা করবেন না?"

উত্তরে শ্রীমতী ঘোষ বললেন, "অনেক ঐতিহাসিক ঐ বিদ্রোহকে বলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংগ। আবার অনেকে তা অস্বীকার করেন। ভাল উত্তরে দু'দিক থেকেই সমস্যাটির আলোচনা করতে হবে। কারণ ও ফলাফলের বিচারও করতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতেই। এর ওপর চাই চিন্তাধারা ও ভঙ্গির উৎকর্ষ—যার কথা আগেই বলেছি।"

"আপনার স্কুলে মেয়েদের নিশ্চয়ই এই ভাবে তৈরি করেন পরীক্ষার জন্যে?"

"ঠিক পরীক্ষার উত্তর লেখার দিকে কিন্তু আমরা জোর দিই না। আমরা এমনভাবে মেয়েদের তৈরি করি, যাতে তাদের ব্যবহারিক চাহিদা মেটে। যেমন ধরুন, প্রায়ই একটা-না-একটা জায়গায় তাদের ঘুরিয়ে আনা হয়। আজ সায়েন্স কলেজ, কাল বিড়লা মিউজিয়াম, কোনদিন হর্টিকালচারাল সোসাইটি, আবার কোনও দিন বা নরেন্দ্রপুর। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্ম-প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অনেক কিছু খুব ভাল করে শিখে যায়। ওগুলো পরোক্ষভাবে তাদের উপকারই করে। বিভিন্ন ক্লাসের মেয়েরা যে-সব প্রকল্প করেছে, তার মধ্যে কয়েকটা হল—পেট্রো-লিয়াম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা, পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের উপজীবিকা ইত্যাদি।"

শ্রীমতী ঘোষ জানালেন যে, এই প্রোজেক্টগুলি কর্মশিক্ষার সিলেবাসের অবশ্যক ব্যাপার নয়। "সে তো আলাদা আছেই।"

শুনে অবাক হলাম, পর্ষদের নতুন পাঠ্যক্রম চালু হবার অনেক আগে থেকেই কমলা গার্লস স্কুলে এইরকম নানা এডুকেশন প্রোজেক্ট' করানো হচ্ছে ছাত্রীদের। এছাড়া ইংরেজী বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি নাট্যাভিনয়—এ-সবের মাধ্যমেও তারা ইংরেজীতে সুশিক্ষা পাচ্ছে। বাংলায় প্রতিদিন ব্ল্যাকবোর্ডে "দিনের বাণী" লিখতে হয়। এর জন্যে ছাত্রীদের ভালভাবে পড়াশুনো করতে হয়। শুধু তাই নয়, কমলা গার্লস স্কুলে দেওয়াল পত্রিকা, সংবাদ বুলেটিন সবই আছে।

অনেক দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম, "পড়া-শোনাটা প্রধানত পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় কি?"

প্রধান শিক্ষিকা বললেন, "লেখাপড়াটা যদি আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয়, তাহলে তার চেয়ে কাম্য আর কিছুই হতে পারে না। আমার মেয়েরা ঐসব কর্মকাণ্ডে উৎসাহ পায়। আর পরীক্ষার কথা আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না। তার প্রমাণ ক্লাস টেস্ট, সাপ্তাহিক পরীক্ষা এবং টিউটোরিয়াল ক্লাস। শেষেরটি অবশ্য শুধু ইংরেজীর জন্যে।"

"ইংরেজী কীভাবে শিখতে হবে?"

"বলা বাহুল্য, ভাল করে টেক্সট পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বই। গোড়া থেকেই সহজ ইংরেজীর ছোট ছোট দু-একখানা গল্পের বই পড়া চাই। আর চাই ওয়ার্কবুক অভ্যাস করা।"

"আর, বাংলা?"

"বাংলাতেও দরকার বাইরের বই পড়া। এবং লেখা। লেখার আগে প্রয়োজন সঠিক উত্তর সম্পর্কে আলোচনা।"

শ্রীমতী ঘোষ আরও বললেন, "ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ম্যাপ, চার্ট, মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে পড়াশোনা করা দরকার। শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিটি টপিকের জন্যে যে সব রেফারেন্স দেবেন, ভাল ফলের জন্যে চাই সেগুলি অনুসরণ করে উত্তর লিখে তৈরি করা। একথা সব বিষয় সম্পর্কেই খাটে। আর, বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে প্র্যাকটিকাল ক্লাস না করলে ও ল্যাবরেটরি নোটবুক না-রাখলে ভাল নম্বর আসবে কী করে? অঙ্ক প্রতিদিনই অভ্যাস করা উচিত। অঙ্কের ভয়কে জয় করতে হবে।"

শ্রীমতী ঘোষ আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, ভাল ফলের জন্যে সহজে বেশী নম্বর তুলতে গেলে মৌখিক, কর্মশিক্ষা এবং শারীরশিক্ষায় অনেক বেশি নম্বর টানতে হবে।

একটা বিষয় শুনে বেশ অবাক হলাম। উনি বরাবরই সিলেবাসের অতিরিক্ত অনেক কিছু মেয়েদের করিয়ে দেন। যেমন, স্কুলের পরীক্ষার মোট নম্বরের শতকরা কুড়ি ভাগ ক্লাসের কাজের জন্যে রেখে দেওয়া হত। এখন ভাবছেন ওটাকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা যায় কিনা। অঙ্কের মধ্যে এত জিনিস যে, মাত্র একশো নম্বরের পরিধিতে অনেক কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাই প্রয়োজনমত একশোর জায়গায় দেড়শো করে নিতে শ্রীমতী গীতা ঘোষের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আপত্তি নেই মেয়েদেরও, কিংবা তাদের অভিভাবকদের।

আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' বিভাগটি সম্পর্কে শ্রীমতী ঘোষ প্রশংসা করলেন।

কী ভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় ভর্তি হয়েছিল কমলা গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে। ফার্স্টও হয়ে আসছে ঐ ক্লাস থেকেই। আগে পড়ত যাদবপুর হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে। রূপালীরা যাদবপুরেই থাকে। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় বৃত্তিও পেয়েছিল ও। মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের মধ্যে হয়ে স্কুলের নাম রাখতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করায় সলজ্জভাবে চুপ করে রইল। শ্রীমতী ঘোষই ওর উত্তরটি আমাকে জানিয়ে দিলেন। "চেষ্টা করছে।"

কথাটা অবশ্য রূপালীর বিভিন্ন উত্তর থেকেই বুঝেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন বিষয় সবচেয়ে ভাল লাগে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই বলে দিল, "লাইফ সায়েন্স।" বলতে-বলতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বাভাবিক। কেননা ও ডাক্তার হতে চায়।

লাইফ সায়েন্সে কী কী বই পড়ে? কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, রবীন্দ্রনারায়ণ পাল, ভট্টাচার্য-গঙ্গোপাধ্যায়-দত্ত, নন্দ-দাশ-গিরি আর কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। এ-ছাড়া অন্য বহু রেফারেন্স বই থেকে দিদি কিছু-কিছু নোটস লিখিয়ে দেন। শুধু লাইফ সায়েন্সের নয়, সব বিষয়েরই দিদি এই রকম লিখিয়ে দেন বলে "আমাদের খুব কমই খাটতে হয়।" জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপালী অতিরিক্ত বিষয় নিয়েছে বায়োলজি। এর জন্যে ও পড়ে ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর এবং দাশ-মুখার্জীর বই। আর রবীন্দ্রনারায়ণ পালের।

ফিজিক্যাল সায়েন্সে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই স্কুলে পড়ানো হয়।

রূপালী তার সঙ্গে পড়ে সমর গুহ-চিত্তরঞ্জন দাশের বই এবং 'বিজ্ঞান-মুকুল'। বিজ্ঞান থেকে এসে গেল অঙ্কের কথা। অঙ্ক ও প্রত্যেক দিনই অভ্যাস করে—একদিনও বাদ দেয় না। স্কুলের বই ছাড়াও বাইরের বই থেকে অঙ্ক করে।

"ভূগোলে বেশী বই পড় না?"

"স্কুলে পাঠ্য শিবরাম ভট্টাচার্য ও মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই। তাছাড়া পড়ি এস পি চ্যাটার্জী, সুনীল চৌধুরী-সত্যেশ মুন্সী, লোকেশ চক্রবর্তী আর পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।"

সংস্কৃতে রূপালী টেক্সট বইটা ভাল করে পড়ে। কিন্তু আসল জোর দেয় ব্যাকরণ—টেক্সট সংক্রান্ত এবং বাইরের—আর অনুবাদের উপর। টেস্ট পেপার্স থেকে এগুলি সে অভ্যাস করে।

ইংরাজী টেক্সটও খুব খুঁটিয়ে পড়ে ও। প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করে। কী রকম পড়া তৈরি হল পরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি পিস-এর সারাংশ ভাল করে লেখে। আর ক্লাসে আলোচিত প্রশ্নের উত্তর বাড়িতে লিখে অভ্যাস করে।

কোথাও কিছু আটকালে রূপালী জবাবটা জেনে নেয় দাদাকে খুঁচিয়ে। দাদা অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় নেতাজীনগর কলেজের অধ্যাপক।

প্রতিদিন চার ঘণ্টা পড়ে রূপালী—সকালে দেড় ঘণ্টা, রাতে আড়াই। ছুটির দিনগুলোয় এটা খানিকটা বাড়ে, বলা বাহুল্য। গল্পের বই পড়তে ওর ভাল লাগে। প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর রবার্ট লুই স্টিভেনসন।

"আনন্দমেলা"র নিয়মিত পাঠিকা রূপালীর উৎসাহ আছে 'লেখাপড়া' বিভাগটি সম্পর্কে। তবে ও চায়, বিভাগটিতে আরও বেশি বৈচিত্র্য আনা হোক। নরেন্দ্রপুর স্কুলের পড়াশোনা সম্পর্কে ও নিয়মিত খবরাখবর রাখে। খেলাধুলাতেও রূপালীর আগ্রহ আছে।

রূপালীর বাবা হিমাংশুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। ওর মা নেই।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

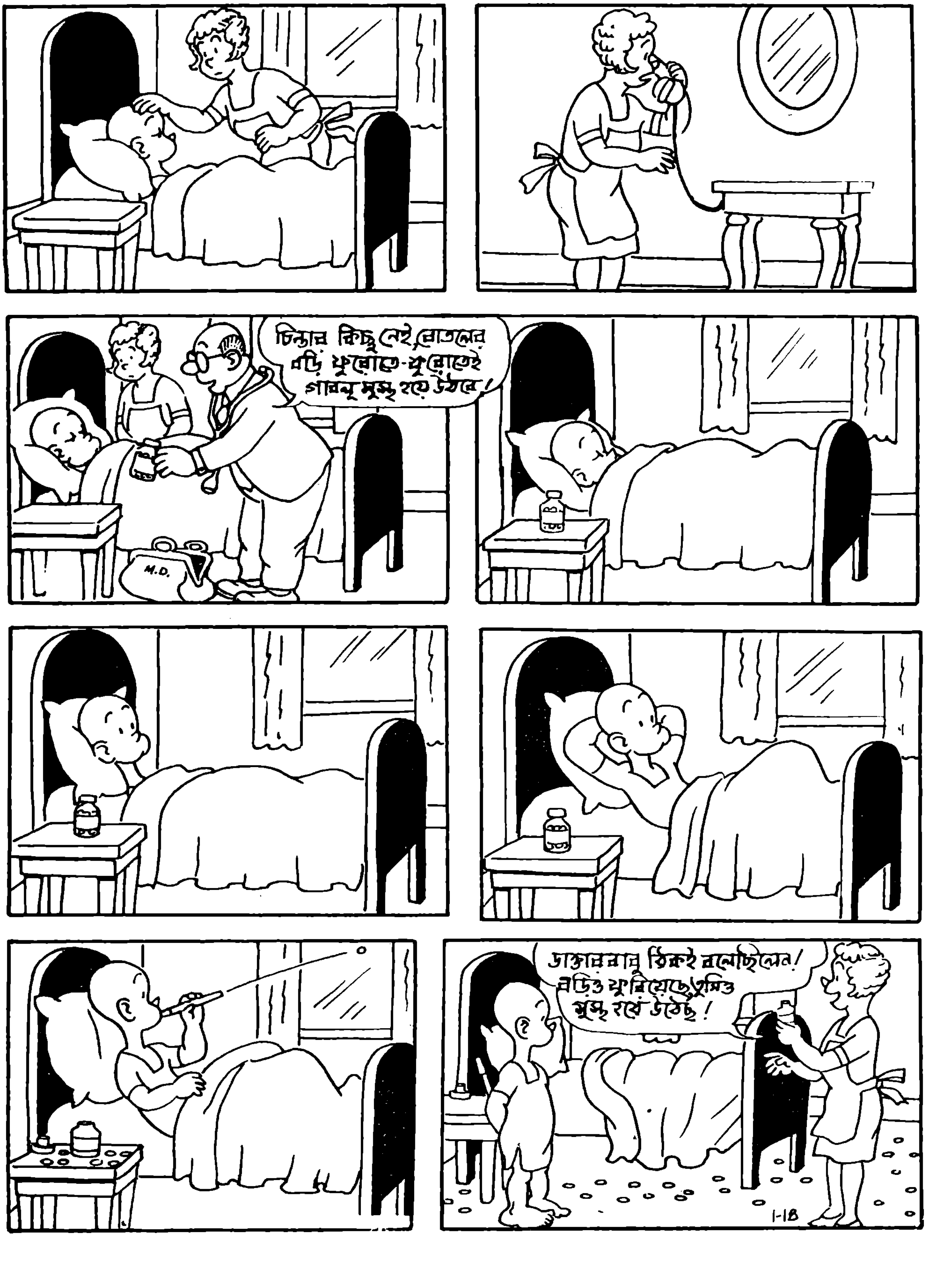
চিন্তার কিছু নেই, বোতলের বড়ি ফুরোতে-ফুরোতেই গাবলু সুস্থ হয়ে উঠবে!
ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন! বড়িও ফুরিয়েছে, তুমিও সুস্থ হয়ে উঠেছ!
1-18

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

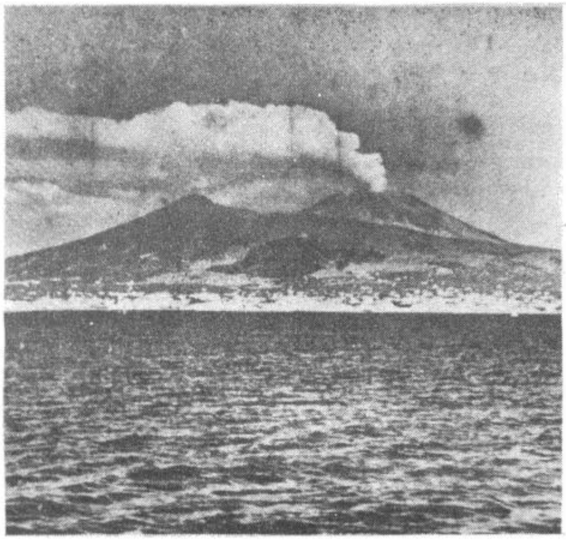

আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীতে অনেক রকমের পাহাড় দেখা যায়, আগ্নেয়-গিরিও এক রকমের পাহাড়। এই পাহাড় অবশ্য অন্যান্য পাহাড়ের মতো মাটি পাথর জমে তৈরি নয়, এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে লাভা জমে জমে। পৃথিবীর ত্বকের কোন ফাটল দিয়ে পৃথিবীর ভেতর থেকে যে গরম গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসে তাকেই বলা হয় লাভা, পৃথিবীর ভেতর যখন এই উত্তপ্ত গলিত পদার্থ জমা হয় তখন একে বলা হয় ম্যাগমা। ভূবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী আগে উত্তপ্ত ছিল, ক্রমশ পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর ভেতরটা এখনও খুব গরম। মাটির নীচে পঞ্চাশ ষাট ফুট নামলেই তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়ে যায়—তাহলেই ভেবে দেখো যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় চার হাজার মাইল নীচে নামলে কী অবস্থা হবে।

পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপ স্ফুটনাঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু তা বলে পৃথিবীর নীচে সব কিছু গলিত অবস্থায় নেই। পৃথিবীর ওপরের স্তরের চাপ পৃথিবীর ভেতরের সব পদার্থকে স্থিতিস্থাপক রেখেছে। কিন্তু কোন কারণে ওপরের স্তরের এই চাপ কমে গেলে এবং মাটির দুর্বল অংশে ফাটল দেখা দিলে এবং গ্যাসের সৃষ্টি হলে, মাটির নীচের পদার্থ সেই ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ক্রমশ ফাটলের চারপাশে জমা হয়। ঠাণ্ডা হলে জমাট বেঁধে কঠিন লাভার সৃষ্টি করে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় আগ্নেয়-গিরি। যে ছিদ্র দিয়ে লাভা বের হয় তাকে বলা হয় জ্বালা-মুখ। লাভা সঞ্চিত হয়ে এই পাহাড় তৈরি হয় বলে একে সঞ্চয়জাত পাহাড়ও বলে।

আগ্নেয়গিরি নানা ধরনের হয়। কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে সব সময়েই লাভার স্রোত বেরিয়ে আসে। কোন কোন আগ্নেয়গিরিতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। কোন কোন আগ্নেয়-গিরি আবার একেবারেই মরে গেছে, দীর্ঘকাল সেগুলি থেকে আর আগুন বা লাভা বেরোয়নি। যেখানে ভঙ্গুর পাহাড় আছে, যেখানকার ভূত্বক দুর্বল, সেখানেই আগ্নেয়-গিরি বেশি আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে আছে আগ্নেয়গিরি, একে বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নি-বলয়। আইসল্যাণ্ডের মাউন্ট হেকলা, ইতালির ভিসুভিয়াস, জাপানের ফুজিয়ামা, মার্টিনিক দ্বীপের পেলি খুবই বিখ্যাত।

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ এমন কী পাতা দেখেছ, যা গাছে গজায় না?
উঃ বইয়ের পাতা আর চোখের পাতা।

প্রঃ কোন্ জায়গা বেজায় শব্দ করে?
উঃ দমদম।

প্রঃ কান টানলে যদি মাথা আসে, তাহলে নাক টানলে কী হবে?

উঃ বুঝতে হবে সর্দি হয়েছে।

প্রঃ কোন শহর খোলা নয়?
উঃ ঢাকা।

প্রঃ কোন্‌খানে বুধের পর শুক্র আর বৃহস্পতির পর শনি?
উঃ সৌরজগতে।

প্রঃ কোন রাজা সকলের আনন্দ বাড়ান?
উঃ হর্ষবর্ধন।

প্রঃ ছোড়দার বয়স একুশ পুরো হলে কী হবে?

উঃ বাইশে পা দেবে।

প্রঃ চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কোন জাঁদরেল সম্রাটকে যুদ্ধে হারিয়ে বিখ্যাত?
উঃ অতটা এখনো আমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়নি।

প্রঃ কোন সমুদ্র হেদোর কাছেই?
উঃ বিদ্যাসাগর।

প্রঃ কোন বিশেষণকে আমরা প্রায়ই খেয়ে ফেলি?
উঃ বিষম।

প্রঃ কোন রাজ্যে দেবতাকে আনা হয়েছে?
উঃ হরিয়ানা।

ভানুমতী

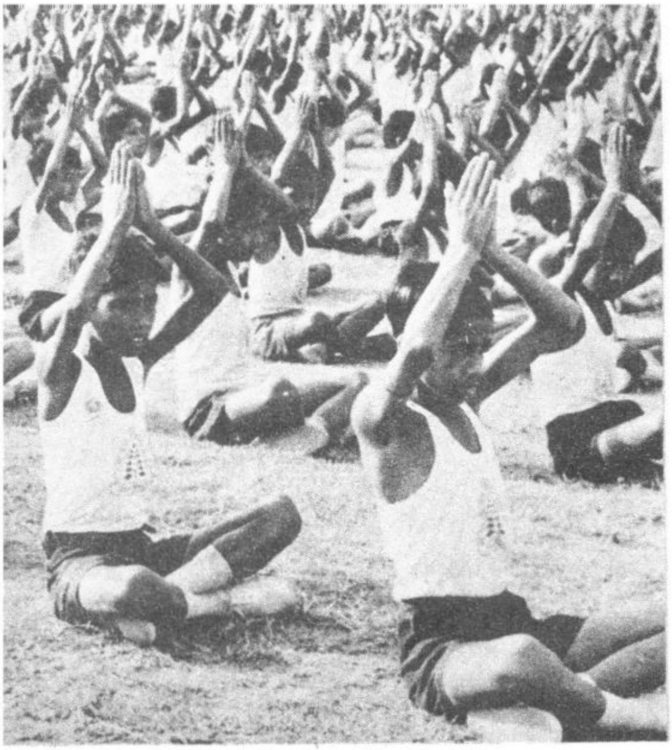

নববর্ষে বিধান শিশু উদ্যানে সমবেত ব্যায়াম

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

২৭ মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে মণিমেলার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মীদের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লটারির পুরস্কারগুলিও দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের শেষে দু-হাজার মণিভাইবোন মার্চ পাস্ট, সমবেত ব্যায়াম, ড্রিল. যোগাসন, জিমন্যাসটিকস, ছড়ার গান ও প্রাদেশিক লোকনৃত্যে অংশ নেয়। ১০ মার্চ সারা পশ্চিম বাংলায় মণিমেলা পতাকা দিবস বিশেষ উৎসাহের সংগে পালিত হয়।

আঞ্চলিক সংবাদ

কলকাতা জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্প্রতি গোয়াবাগান সি আই টি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দমদমের পূর্বাচল মণিমেলা।

নবাংকুর, বজবজ ও চলন্তিকা মণিমেলা যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে। বারুইপুর আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে কিংশুক মণিমেলা। দমদম আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ ও ছড়ার ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় পূর্বাচল ও মৌসুমী মণিমেলা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

মণি-সন্দেশ

হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার ভাইবোনেরা বক্রেশ্বর, তারাপীঠ ও শ্রীনিকেতন ঘুরে এল। এদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ পরগনার গরিফা মণিমেলার ও সন্তোষপুরের নবাংকুর মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্দলের নবমিতালী মণিমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি। দমদমের পূর্বাচল মণিমেলা এক শিক্ষা ভ্রমণে ঘাটশীলা ও জামসেদপুর ঘুরে এসেছে। নৈহাটীর ব্লু স্টার মণিমেলা ছোটদের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করে। সোনারপুরের কিংশুক মণিমেলা স্থানীয় এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে। হাওড়ার স্বামীজী-মণিমেলা এবং কল্যাণীর অনামিকা মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি।

ডোডো তাতাই

লেখা/তারাপদ রায়
রেখা/কৃত্তিবাস রায়

এ-বছর ভীষণ গরম পড়েছে। একটু বেলা বাড়তেই রোদ্দুর থেকে কাঁচা লঙ্কার মত ঝাঁঝ বেরোচ্ছে। গরমের ছুটিতে ডোডোবাবু বাড়িতে এসেছেন নরেন্দ্রপুর থেকে, তাতাইবাবুরও ছুটি। কিন্তু গরমের জন্যে খেলাধুলো জমছে না। অন্যান্য বছরে গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুর বেলা পন্ডিতিয়ার রাস্তায় ডোডোবাবু-তাতাইবাবু সবান্ধবে ফুটবল, চোর-চোর, বিটু এই সব কত রকম খেলা খেলেছেন, কিন্তু এ-বছরের রোদে খুব কষ্ট হচ্ছে। আসলে হয়েছে কী, ডোডোবাবু-তাতাইবাবু এখন একটু বড় হয়েছেন, এতদিন তাঁদের শীতগ্রীষ্মের বোধ ছিল না, এখন তাঁরা আস্তে-আস্তে অল্প-অল্প করে মানুষ হচ্ছেন।

তাই দুপুরের রোদ্দুর বাদ দিয়ে সকালের দিকে যতদূর সম্ভব দৌড়-ঝাঁপ করে দুজনে সেটা পুষিয়ে নিচ্ছেন। অনেকদিন পরে ডোডোবাবুকে পেয়ে তাতাই-বাবুর বশংবদ কুকুর চিলিও উত্তেজিত। প্রতিদিন খুব ভোরবেলা উঠে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু চিলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন লেকের দিকে। চিলি খুব সুন্দর কুকুর নয়। লোকে কত চমৎকার ছোট-বড়, সাদা-কালো-বাদামি, পাখির পালকের বালিসের মত, হিংস্র হায়েনা বা ভাল্লুকের মত, কুকুর নিয়ে লেকে বেড়াতে আসে, সেখানে চিলি বড়ই বেমানান। কিন্তু চিলি সেটা পুষিয়ে নেয় তার আন্তরিকতা আর অফুরন্ত ফুর্তি দিয়ে। তবু ডোডোবাবু-তাতাইবাবুর মনটা খচখচ করে, কেউ ভাল করে দেখে না চিলিকে। অবশেষে একটা বুদ্ধি বেরিয়েছে. চিলির গলায় বকলসের সংগে একটা কার্ডে কী সব লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সকলেরই কৌতূহল হচ্ছে, কুকুরের গলায় কী লেখা আছে জানার জন্যে।

কিন্তু সাবধান, কেউ যদি কোনো সকালে লেকে দেখতে পান দুজন বালকের সঙ্গে একটি আধা দেশি কুকুর, আর কুকুরের গলায় কার্ডে কী সব লেখা, সেই কার্ডটি পড়তে যাবেন না, কারণ সেখানে লেখা আছে :—

"আমি মশাই পন্ডিতিয়ার
তাতাই বাবুর কুকুর,
আপনি মশাই কোথাকার
কোন্ বাবুর কুকুর?"

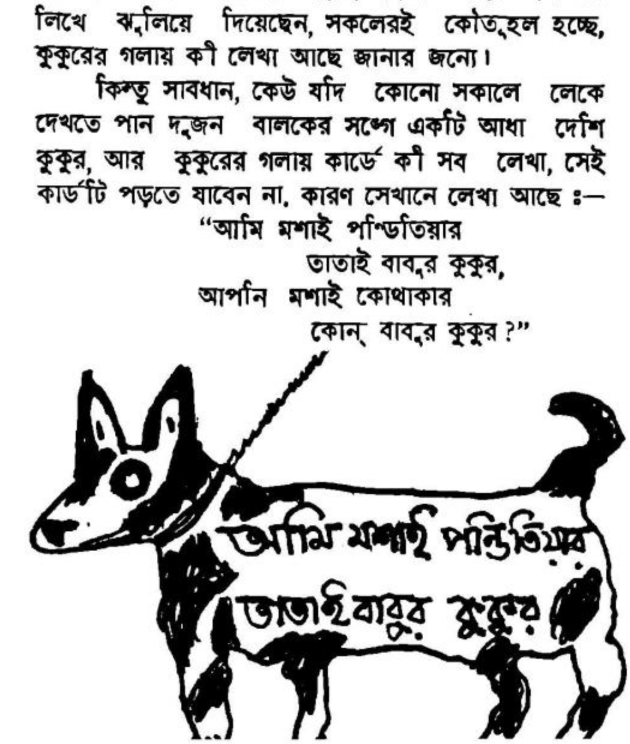

গত বছরের খেলা। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান-গোলের সামনে বিপজ্জনক পরিস্থিতি

ফুটবল-লীগে কে কেমন খেলবে

পুষ্পেন সরকার

কলকাতায় সব থেকে বড় খেলা ফুটবল। ক্রিকেট নিয়ে মাত্র কয়েক-দিনের হৈ চৈ। তাও যদি টেস্ট ম্যাচ হয়। হকি মাঠ খালি থাকে। ভলিবল এবং কবাডির দর্শক বাড়ছে। কিন্তু ফুটবলের তুলনায় কিছুই নয়। অন্য খেলার খবর রাখে সামান্য কিছু উৎসাহী।

ফুটবল মাঠে পড়লেই কলকাতার ময়দান ঘুম থেকে জেগে ওঠে। চারিদিকে হৈ চৈ। পথেঘাটে, দোকানে, বাজারে, অফিসে, কাছারিতে, এক কথায় সব জায়গাতেই ঐ এক আলোচনা। খবরের কাগজ বাড়িতে এলে প্রথমেই ওলটানো চাই খেলার পাতা।

মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল যেদিন খেলে, সেদিন তো কথাই নেই। কাতারে-কাতারে মানুষ যায় ময়দানে। এক অপূর্ব দৃশ্য। মনে হয় যেন এক বিরাট উৎসব। পড়িমড়ি করে ছেলে বুড়ো সকলেই ছোটে একসঙ্গে। রোদ, জল, ঝড়, বৃষ্টি কোনটাতেই ভয় পায় না ফুটবল-দর্শকরা।

খেলার শেষে আর-এক দৃশ্য। প্রিয় দলের জয়ের আনন্দে রাস্তাঘাটের আর-এক ছবি। চারিদিকে আনন্দের জোয়ার। কেউ নাচছে, কেউ চিৎকার করছে, আবার গায়ের জামা খুলে লাফাচ্ছে কেউ-কেউ। বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা। বাসের মাথায় বা ট্রামের সামনে ক্লাব-পতাকা। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, বাড়িতে, ক্লাবে, সর্বত্র সেদিন একমাত্র আলোচনা—কে কেমন খেলল,

গত বছরের খেলা। ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল-গোলের সামনে বিপজ্জনক পরিস্থিতি

খেলার আসর

নানারকম খেলা আর তার হরেক রকম লেখা, ছবি ও কার্টুনে ঠাসা শুধুমাত্র খেলার পাক্ষিক পত্রিকা 'খেলার আসর' বেরিয়েছে।

যা জানতে চাও তার সবই আছে এই সংখ্যায় ঃ

- মাঠের বাইরে শ্যাম থাপা কেমন করে সময় কাটায়।
- লীগ চ্যাম্পিয়নের লড়াইয়ে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল কেবল নয়, লড়বে মহামেডান স্পোর্টিং-ও। কিন্তু কেমন করে?
- হকি নিয়ে ওলিম্পিক কোচ গুরবক্স সিং-এর নানা কথা।
- জবাব আছে প্রসূন ব্যানার্জী আর সুরজিত সেনগুপ্তর।
- দাবার মজাদার কাহিনী।
- বুলা নাথ সাঁতারে কীভাবে এত রেকর্ড করছে।

প্রতিটি পাতায় অজানা আরও নানা ছবি ও খবর যা কোথাও পাবে না। হ্যাঁ, এবার আর পাবে ১৮৭৭ সালে যে ইংল্যাণ্ড দলটি মেলবোর্ণে টেস্ট খেলতে গিয়েছিল তাদের ছবি। বাঁধিয়ে রাখার মত ছবি শ্যাম থাপার।

দাম মাত্র এক টাকা

'খেলার আসর' বেরোবে প্রতি ইংরাজি মাসের ১লা ও ১৬ তারিখে।

খেলার আসর, ইত্যাদি প্রকাশনী, ৭ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩।
ফোন ২৪-৫৫২০

কীভাবে গোল দিল, কেন আরও বেশি গোল হল না। সত্যিই কলকাতার মানুষ—বাংলার মানুষ ফুটবলকে ভালবাসে মনেপ্রাণে।

দল গড়া হয়ে গেছে। নতুন যারা এসেছে এবং পুরনো যারা আছে, এই দুইয়ে মিলে কোন্ দল কেমন খেলবে, তাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছে সকলে। মে মাসের মাঝামাঝি বা তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সেই দুর্গাপূজা পর্যন্ত ফুটবল মাতিয়ে রাখবে অগণিত মানুষকে।

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে ২৩টি দল আছে। প্রত্যেক দলকে অন্য ২২টি দলের সঙ্গে খেলতে হবে। খেলায় জিতলে ২ পয়েন্ট। ড্র করলে এক পয়েন্ট। সব খেলা খেলে যে-দল সব থেকে বেশী পয়েন্ট পাবে, তারাই হবে লীগ চ্যাম্পিয়ন। এবারে প্রথম ডিভিশনের দলগুলি হল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোরটিং, এরিয়ান, জর্জটেলিগ্রাফ, রেজিমেন্ট অফ আর্টিলারি, ইস্টার্ন রেল, বাটা, পোর্ট কমিশনার্স, বি এন আর, ক্যালকাটা জিমখানা, খিদিরপুর, রাজস্থান, উয়াড়ি, সালকিয়া ফ্রেন্ডস, কালীঘাট, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, বাটা, কুমারটুলি, স্পোরটিং ইউনিয়ন, চন্দ্র মেমোরিয়াল, হাওড়া ইউনিয়ন এবং কাস্টমস। গতবারে সব থেকে কম পয়েন্ট পাওয়ায় পুলিস দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গেছে। দ্বিতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন কাস্টমস উঠে এসেছে প্রথম বিভাগে।

গত বছর মোহনবাগান ২২টি খেলার ২০টি জিতে ও দুটি ড্র করে মোট ৪২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অনেক নামী নামী খেলোয়াড় নিয়ে এবারে তারা দল গড়েছে। বেশ কয়েক বছর পর চ্যাম্পিয়ন হবার আনন্দ গতবারে ভালভাবে উপভোগ করেছে মোহনবাগান-সমর্থকরা। এবারেও দারুণ খেলবে আশা করছে।

একটানা ছয়বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার নতুন রেকর্ড করে গতবার মাত্র এক পয়েন্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। হারিয়ে-যাওয়া সম্মান আবার এবারে ফিরিয়ে আনতে খেলোয়াড়রা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। রাশিয়ার পাকতাকোর ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের তরুণ খেলোয়াড়দের খেলা সমর্থকদের মনে নতুন আশা জাগিয়েছে।

মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হবার পথে প্রধান বাধা হবে মহমেডান স্পোর্টিং। যে কোন দলকে হারিয়ে দেবার শক্তি ওরা রাখে। স্থানীয় কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দলে এসেছে। ফলে শক্তি আরও বেড়েছে। স্ট্রাইকার লতিফুদ্দিন সুযোগ পেলেই গোল করে বসতে পারে। এবারে জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে বাংলার একমাত্র জয়সূচক গোলটি লতিফুদ্দিন করেছিল। লীগের শেষ দিকে মহমেডানের খেলা কেমন যেন ম্লান হয়ে আসে। তবে শোনা যাচ্ছে, শেষ দিকের এই ঢিলেমি দূর করার জন ক্লাব-কর্মকর্তারা খুব সতর্ক থাকবেন।

বড় দলগুলির বিরুদ্ধে ভাল খেলার একটা সুনাম আছে এরিয়ানের। সাধারণ খেলোয়াড় নিয়েও ওরা অসাধারণ হয়ে ওঠে। তাই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোরটিংয়ের মস্ত দুর্ভাবনা এরিয়ানকে নিয়ে। গত বছর মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হবার পথে কী সাংঘাতিক বাধাই না দিয়েছিল এরিয়ান। খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনে এরিয়ানের বিশেষ লোকসান হয়নি। এবারেও কোন দলকেই এরিয়ান সহজে ছেড়ে দেবে না।

তরুণ ও উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ গত বছর দল গড়েছিল এবং ১১টি খেলায় জিতে ও ৬ ড্র করে লীগ তালিকায় পঞ্চম স্থান পেয়েছিল। পুরনো অধিকাংশ খেলোয়াড় আছে। দু-একজন নতুন এসেছে। খেলায় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে পারলে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারানো শক্ত।

সৈনিকদের দল রেজিমেন্ট অব আর্টিলারির খেলোয়াড়রা বেশ শক্তসমর্থ। অফুরন্ত দম। লম্বা লম্বা পাসে খেলে। পায়ে জোরালো শট। ভারতের নানা জায়গায় ওদের রেজিমেন্টের বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে এবারে আরও ভাল দল গড়বে। গতবার প্রথম খেলেছিল লীগে। কলকাতার মাঠের হালচাল তেমন জানা ছিল না। এখন অভিজ্ঞতা বেড়েছে।

প্রতি বছরেই খিদিরপুর কিছু নতুন খেলোয়াড় তৈরি করে। নাম হলেই তারা বড় দলে চলে যায়। এবারেও কয়েকজন গেছে। তবুও সকলের আশা, কিছু নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভা খিদিরপুর দেখাতে পারবে। কোনদিন ওরা কী করে বসে বলা যায় না। এছাড়া রাজস্থানও খারাপ খেলবে না। বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পেয়েছে। গতবারে ইস্টার্ন রেল খারাপ খেলেনি। সপ্তম স্থান ছিল। এবারে আরও ভাল ফল দেখাবে—ওদের বিশ্বাস। এ ছাড়া অন্য দলগুলিও যথাসাধ্য শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছে। প্রাণপণ অনুশীলন করেছে।

ফলে এবারের ফুটবল মরসুম দারুণ জমবে। ফ্লাড লাইটে খেলা আর এক বাড়তি আকর্ষণ। তোমাদের প্রিয় দলের খেলোয়াড়রা ভাল খেললে যেমন তাদের তোমরা প্রশংসা করো, বিপক্ষ কোন দল বা কোন খেলোয়াড় যদি ভাল খেলে তাদেরও অবশ্যই সুখ্যাতি করবে। এমনি খেলোয়াড়োচিত মন নিয়ে যদি খেলা দেখতে পারো, তাহলে আনন্দ অনেক বেশি পাবে।

EIA 77/1

মজার ক্রিকেট

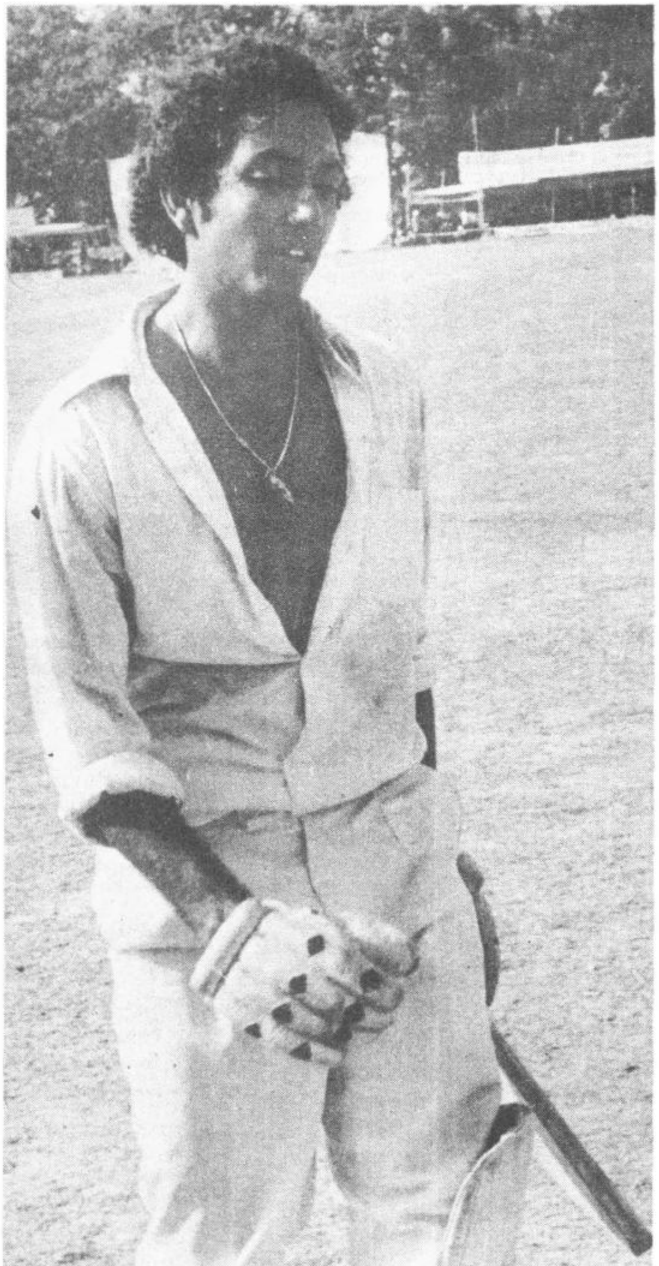

মহিন্দর অমরনাথ। একলা-ক্রিকেট দারুণ খেলেছেন

এ আবার কী ধরনের ক্রিকেট! আমরা তো বরাবর জানতাম খেলা হয় দুটি দলের মধ্যে—হয় সেটা ভারত বনাম ইংল্যান্ড, নয় বাংলা বনাম হরিয়ানা, কিংবা কালীঘাট বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। এর মধ্যে আবার "ব্যক্তিগত" প্রতিযোগিতার সুযোগ কোথায় ?

এপ্রিলের গোড়ায় বালিগঞ্জে ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত পূর্ব-ভারতের প্রথম সিঙ্গল-উইকেট ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন আমাদের টেস্ট অল-রাউন্ডার মহীন্দর অমরনাথ। তিন হাজার টাকা পুরস্কারের সঙ্গে তিনি পেলেন সুন্দর টেজিরামা ট্রফি। এই প্রতিযোগিতার সূত্রে খেলা-পাগল কলকাতায় দেখা গেল ক্রিকেটের এক নতুন রূপ।

খেলার মাঠের দিকে তাকালে চট করে তফাত বোঝা যায় না; একটু খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য চোখে পড়ে, উইকেটে মাত্র একজন ব্যাটসম্যান; আর বাইশ-গজ পিচের মাঝবরাবর দুদিকে সাদা দাগ। খেলার নিয়ম খুবই সহজ। দুজন মাত্র প্রতিযোগীর লড়াই। একজন আর-একজনের চার ওভার বল খেলতে পারবে, তার আগে আউট হলে পাল্লা সেখানেই শেষ। আর, যে বেশি রান করবে সেই জয়ী হবে। বোলার উইকেটের দুই প্রান্ত থেকে বল করবে। তাকে সাহায্য করবে নিরপেক্ষ ন'জন ফিল্ডার আর একজন উইকেটরক্ষক। তবে, ফিল্ডারদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্যাটসম্যান রান নেওয়ার সময় যদি পিচের মাঝবরাবর লাইন পার হয়ে যায় তাহলে তাকে রান আউট করতে হলে সে যে উইকেটের দিকে এগোচ্ছে সেইটিকেই ফেলতে হবে। পাড়ার রাস্তায় ক্রিকেটের সেই "হাফ-গ্রাউন্ড" পার হবার মতন ব্যাপার।

সিঙ্গল-উইকেট ক্রিকেট বহুকালের পুরনো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে এই রকম ক্রিকেটের খুব চল ছিল। দেশব্যাপী প্রতিযোগিতাও হত। যে জিতত সে 'চ্যাম্পিয়ন অফ ইংল্যান্ড' খেতাব পেত। এম সি সি (লন্ডনের মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) প্রচারিত ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনে এই প্রতিযোগিতার বিশেষ নিয়মাবলীর উল্লেখ ছিল। তবে এই সব খেলার ফলাফল নিয়ে এমন বাজি ধরাধরি শুরু হয়ে গেল যে, প্রায় সব খেলাতেই খেলোয়াড়দের ঘুষ দেওয়া হতে লাগল। এর ফলে খেলার মেজাজই নষ্ট হয়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে গেল সিঙ্গল-উইকেট ক্রিকেট।

সিঙ্গল-উইকেট আবার শুরু হয় ১৯৬৩ সালে। ইংল্যান্ডের স্কারবোরোতে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে যে প্রতিযোগিতা হয় তাতে ভারতের চাঁদু বোর্দে অংশ নেন। এই ধরনের সব প্রতিযোগিতাতেই আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। দেখতে দেখতে ভারতেও হাজির হয় এই "ব্যক্তিগত" ক্রিকেট। বোম্বাইতে বিজয় মার্চেন্টের নামে যে প্রতিযোগিতা হয় ইতিমধ্যেই তার সাত বছর হয়ে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার এই টেলিরামা ট্রফিও হয়ত বিশেষ এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে।

দেড়শো বছর আগেকার সিঙ্গল-উইকেট ক্রিকেটের নিয়মকানুন অবশ্য অন্য ধরনের ছিল। যেমন, কত ওভার খেলা হবে তার কোনও সীমা ছিল না; ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বল মারতে পারত না; বোলার মাত্র তিন-চারজন ফিল্ডারের সাহায্য পেত; কেবল উইকেটের সামনে বল মারলে ব্যাটসম্যান রান নিতে পারত; আর একটি রান পুরো করতে হলে একবার গিয়ে বোলারের উইকেট ছুঁয়ে আবার ক্রিজে ফিরতে হত।

সিঙ্গল-উইকেট আসলে মজার ক্রিকেট। এই খেলায় অনেক বড়-বড় মার দেখা যায়, রান বাঁচাবার জন্য অদ্ভুত ফিল্ডিং সাজানো হয়। তার, কে যে জিতবে, সত্যিই বলা কঠিন। মহীন্দর অমরনাথ জিতলেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্য খারাপ হলে প্রথম বলেই ছক্কা মারতে গিয়ে বাউন্ডারিতে এক মারাত্মক ক্যাচে আউট হয়ে যেতে পারতেন। সেদিন বালিগঞ্জ মাঠে কিন্তু বাংলার ছেলেরা কয়েকটি ভাল ক্যাচ ধরলেও অনেকগুলি ক্যাচ ফেলে-ছিলেন। ফিল্ডিং, ধরতে গেলে, বেশ খারাপই হয়েছিল। তবে আনন্দের কথা যে, বাংলার অলোক ভট্টাচার্য সেমি-ফাইনাল রাউন্ড পর্যন্ত উঠে-ছিলেন। আর, কোয়ার্টার-ফাইনালে ছিলেন স্থানীয় খেলোয়াড়দের আরও তিনজন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

সুব্রত সরকার

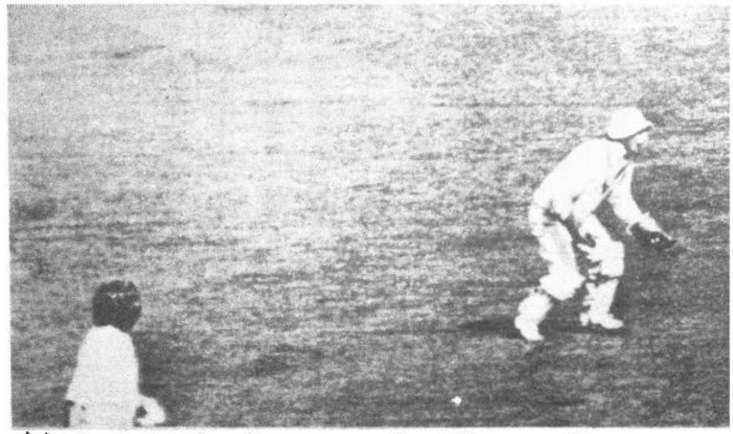

টেস্ট খেলার শতবর্ষ। ইংলণ্ডের ক্যাপটেন টোনি গ্রেগ ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচ

সেই বৃহস্পতিবার দুপুরে আনন্দবাজার অফিসের টেলিপ্রিন্টারে দারুণ অবাক হয়ে যাওয়ার মতো খবরটি এল। খবরটি হল মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত শতবার্ষিকী টেস্ট-এ ইংল্যাণ্ডকে অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে পরাজিত করেছে। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে দুই দেশের টিমের প্রথম টেস্টের (যে খেলার কথা ফাল্গুন মাসের 'আনন্দমেলা'য় লেখা হয়েছিল) ইংল্যাণ্ড দল ঠিক অবিকল একই রানসংখ্যায় হেরেছিল। সত্যিই অবাক হওয়ার মতো খবর না? দু-দিনের জন্য খালি দিনটা মেলেনি। ১৮৭৭-এর সেই প্রথম টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়েছিল সোমবার, ১৯ মার্চ; শতবার্ষিকী টেস্টের সমাপ্তি ঘটল ১৭ মার্চ। তবে অদ্ভুত ঘটনা আরেকটি ছিল। গত মার্চ মাসের ওই ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া খেলাটি টেস্ট ম্যাচ ইতিহাসের কালক্রমানুসারে ঠিক আটশো নম্বরের খেলা।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-কর্তারা শতবার্ষিকী টেস্ট উপলক্ষে অনেক ঘটা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া খেলায় অংশ নিয়েছেন এমন বহু প্রাক্তন খেলোয়াড় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মেলবোর্নে। অনেকেই ভেবেছিলেন অস্ট্রেলিয়া জিতবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড যে ঠিক ৪৫ রানেই হারবে—এটা কেউ-ই ভাবতে পারেনি।

ইংলণ্ড কিছুদিন আগে ভারতকে হারালেও তাদের দলে বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল। বর্তমানের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান জেফ্ বয়কট বা ১৯৭৫-এ অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট-বোলারদের বিরুদ্ধে সবচাইতে সফল ব্যাটসম্যান ডেভিড স্টীল মেলবোর্নে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সফরকারী দলে ছিলেন না বলে শতবার্ষিকী টেস্টের জন্য বিবেচিত হননি। তবে ১৭৪ রান করে খেলাটিকে জাগিয়ে তুললেন সেই ডেরেক র‍্যানডাল, ভারতের বিরুদ্ধে যাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৩৭, ইনিংসের গড় ১২ থেকে সামান্য বেশি।

অস্ট্রেলিয়ারও কিছু অসুবিধে ছিল, তবে অভিজ্ঞ ইয়ান চ্যাপেল আর ইয়ান রেডপাথ অবসর গ্রহণ করায় যে ঘাটতি হয়েছে তা বুঝতে দিলেন না উইকেটরক্ষক রড মারশ। তিনি ১১০ রানে অপরাজিত ছিলেন। আর জেফ টমসন আহত থাকলে কী হবে, তাঁর জুটি ডেনিস লিলি তো একাই একশ। তিনি এই খেলায় ১৬৫ রানে এগারোটি উইকেট পান। ম্যাচের শেষে তিনি ঘোষণা করেন, লোয়ার লাম্বার ভারটিব্রায় পুনরায় স্ট্রেস ফ্র্যাকচার দেখা দেওয়ায় তিনি বছরখানেক আর টেস্ট খেলবেন না। অতএব শতবার্ষিকী টেস্টে লিলির ভূমিকা সত্যিই খুব উল্লেখযোগ্য ছিল।

ঝন্টু-মন্টুর গল্প (৭)

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১১ বছর

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুদের মত তোমারও। এই শহরটার ভালো মানে তোমারও ভালো,— ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

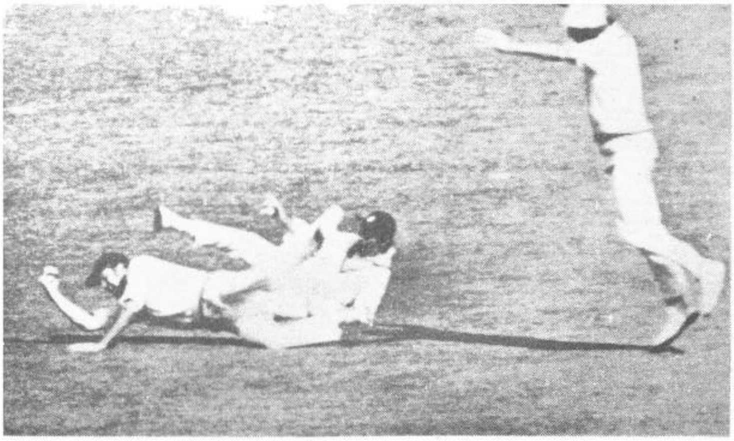

আউট করছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্যারি গিলমোরকে

একশো বছর আগের খেলাটির মতন এবারও মেলবোর্নে টসে জেতেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। গ্রেগ চ্যাপেল অবশ্য ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারলেন না। তিনি নিজে ৪০ রান করলেও ইংল্যাণ্ডের নিখুঁত পেস ও মিডিয়াম-পেস বোলিং এবং মারাত্মক ক্লোজ-ইন ফিল্ডিংয়ের দাপটে মাত্র ১৩৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার সব উইকেট পড়ে যায়। দিনের শেষে ইংল্যাণ্ড একটি উইকেট হারিয়ে ২৯ রান করে। প্রথম দিনের সাফল্য প্রায় সবটাই তাদের।

রবিবার সকালেই লিলি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। মাত্র ৬৬ রান যোগ করে ইংল্যাণ্ড অল আউট হয়ে যায় ৯৫ রানে। অস্ট্রেলিয়ার সামান্য টোটালেরও ৪৩ রান পিছনে ছিল ইংল্যাণ্ড। লিলি মাত্র ২৬ রানে ছটি উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হয়, তখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফায় হয়েছিল তিন উইকেটে ১০৪। পরিস্থিতি অদের কিছুটা অনুকূলে থাকলেও কেউই জোর দিয়ে বলতে পারছিল না যে, ম্যাচের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে।

সোমবার সারা দিন অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করে। আট উইকেটে ৩৮৭ রান করে তারা মোট ৪৩০ রান এগিয়ে থাকে। এই তৃতীয় দিনে সবাই কিছু কিছু রান করে আউট হন। আগের দিনের অপরাজিত ওপেনার ইয়ান ডেভিস ৬৮ আর ডগ ওয়াল্টার্স ৬৬, একুশ বছর বয়স্ক টেস্ট নবাগত ডেভিড হুকস ৫৬। শেষের দিকে মারশের (৯৫ নট আউট) সঙ্গে জুটি বাঁধেন রিক ম্যাক্‌কস্কার। প্রথম দিনে উইলিসের বলের আঘাতে এঁর চোয়ালের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। ম্যাক্‌কস্কার খেলতে নামেন তাঁর ফাটা চোয়াল নিয়ে।

মঙ্গলবার বিরতি দিবসের পর চতুর্থ দিনের সকালে ম্যাক্‌কস্কার আর মারশ তাঁদের নবম উইকেটের জুটিতে আরও ২০ রান যোগ করে ৫৪ অবধি নিয়ে যান। দলের মোট রানসংখ্যা যখন নয় উইকেটে ৪১৯, মারশ ১১০-এ নট আউট তখন চ্যাপেল ডিক্লেয়ার করেন। জিততে হলে ইংলণ্ডের দরকার ৪৬৩ রান, হাতে সময় এগারো ঘন্টার মতন। আর ইংল্যাণ্ডের প্রথম উইকেটটি যখন মাত্র ২৮ রানের মাথায় পড়ে যায় তখন অস্ট্রেলিয়ার জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এবার খেলতে নামেন ডেরেক র‍্যানডাল। আরম্ভ করেন অসাধারণ এক ইনিংস। ব্রিয়ারলি আউট হন ১১৫ রানে, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ডেনিস অ্যামিস নেমে তরুণ র‍্যানডালকে মদত দিয়ে যান। লিলির প্রচণ্ড তেজের বিরুদ্ধে র‍্যানডাল দারুণ খেলে ৮৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যাণ্ডের জিততে দরকার তখনও ২৭২—অনেক রান, তবে সবাই বলতে থাকেন, ইংল্যাণ্ড অন্তত লড়ে হারছে।

শেষ দিন লাঞ্চের সময় কেউ আর সাহস করে কোনও মন্তব্য করছিলেন না। র‍্যানডালের শত রান অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, তিনি আর অ্যামিস তখনও একসঙ্গে। জিততে হলে আরও ২০০ রানের প্রয়োজন। হাতে আছে আটটি উইকেট। মধ্যাহ্নভোজের ১০ মিনিট পরে অ্যামিস (৬৪) আউট হন। অধিনায়ক টোনি গ্রেগ (৪১) বেশ খেলতে থাকলেও, ৩৪৬ রানে র‍্যানডাল যখন আউট হন, তখন আর লিলিকে কে আটকায়! অ্যালান নট ৪১ রান করেন, লিলি ১৩৯ রানে পাঁচটি উইকেট নেন, আর, ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয় ৪১৭ রানে। র‍্যানডাল-অ্যামিস একসঙ্গে থাকার সময় স্কোর ২৯০ পর্যন্ত উঠেছিল—তাই হিসেব করে দেখলে বোঝা যায়, শেষ আটটি উইকেট পড়ে ১২৭ রানে।

র‍্যানডাল 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' পুরস্কার পান। দারুণ খেলেছিলেন তিনি। তবে লিলির বোলিংও কিছু কম প্রশংসনীয় নয়। ম্যাক্‌কস্কারের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তিনি দলের টোটাল ৫৪ এগিয়ে দেন। তিনি না নামলে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে যা টার্গেট দিতে পারত সেই রান তারা হয়ত করে ফেলতে পারত। শতবার্ষিকী টেস্টে ছোট-বড় নানা ঘটনা মিলিয়ে এই খেলাটির কথা দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

কলকাতা থেকে বার্মিংহামে

চিরঞ্জীব

তেত্রিশতম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। ঠিক দু বছর পর এবার চৌত্রিশতম প্রতিযোগিতা হল একইভাবে, ২৬ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বার্মিংহামের ন্যাশনাল একজিবিশন সেন্টার হলে।

ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এই চব্বিশ মাসের ব্যবধানে অনেক ঘটনা ঘটে গেল পিংপং খেলায়।

গতবার প্রতিযোগিতার সময় কলকাতায় এসে বার্মিংহামের লর্ড মেয়র ই জে এমস বলেছিলেন, আমার ছোট্ট শহর তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছে সাতাত্তর সালের প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্য। বার্মিংহাম কথা রেখেছে বিশ্ব টেবল টেনিস সুসম্পন্ন করে। কলকাতায় নেতাজী স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছিল পাশাপাশি কুড়িটি টেবলে এক সঙ্গে, আর ক্ষুদিরাম হলে প্র্যাকটিস দশটিতে। বার্মিংহামে ছিল খেলার জন্য চব্বিশটি টেবল আর প্র্যাকটিসের জন্য আঠারোটি। আমাদের স্টেডিয়ামে সাড়ে বারো হাজার দর্শক বসাবার ব্যবস্থা ছিল, বার্মিংহামে দশ হাজার। আতিথেয়তার ব্যাপারেও

জাপানের মিৎসুরু কোনো

বার্মিংহাম কলকাতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি রয় ইভান্স তো বলেও গেছলেন দু বছর আগে : এই ব্যাপারটিতে কলকাতাকে কেউ টেক্কা দিতে পারবে না।

বার্মিংহামের তুলনায় কলকাতার খেলাগুলি হয়েছিল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক। তবে এবার সব চাইতে আনন্দের কথা, বিশ্ব টেবল টেনিসে এশিয়াই যে এগিয়ে, আবার তা প্রমাণ হয়েছে। সবার আগে রয়েছে চীন। জাপান হৃত মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। সবচেয়ে অবাক করেছে ছোট্ট দেশ উত্তর কোরিয়া। মনে আছে তার কথা, যে অখ্যাত স্কুল-ছাত্রীটি কলকাতায় এসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার জি জিয়েস্ট কাপ জিতে রাতারাতি পৃথিবীখ্যাত হয়েছিল? গত কুড়ি বছরের মধ্যে বিশ্ব টেবল টেনিসে উত্তর কোরিয়ার এই পার্ক ইয়ং সুনের মত কৃতিত্ব আর কারও নেই। অনেক আগে পরপর ছয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড আছে রোমানিয়ার এ রোজিনুর। তার আগে পরপর তিনবার হাঙ্গেরির জি ফারকাসের। পার্ক কলকাতাতে ফাইনালে হারিয়েছিল চীনের চ্যাং লি-কে। গতবার চ্যাং লি প্রথম খেলায় ২৬—২৫ পয়েন্টে জেতেন, তারপর হারেন ১২—২১, ১৪—২১, ১৫—২১। পার্কের কাছ থেকে অভিজ্ঞ চ্যাং এবার একটিও গেম ছিনিয়ে নিতে পারেনি। অর্থাৎ পার্কের জয় হয়েছে ৩—০। টেবল টেনিসে চীন এগিয়ে তার প্রমাণ এবার মেয়েদের সেমি-ফাইনালও। পার্ক ছাড়া বাকি তিনজনই চীনা। চ্যাং লি, চ্যাং তে-ইং ও শিয়ান আই-কে। পুরুষ ও মেয়েদের দলগত খেলায় কলকাতায় দুটিতেই চীন চ্যাম্পিয়ন ছিল। এবারও কেউ তাদের সেই আসন থেকে টলাতে পারেনি। সোয়েথলিং ও করবিলন কাপ আবার তারাই জিতল। সাম্প্রতিককালে এমন সফল হয়নি কেউ।

মার্সেল করবিলন কাপ অর্থাৎ মেয়েদের দলগত খেলায় ফাইনালে এই নিয়ে পর পর তিনবার চীন বনাম দক্ষিণ কোরিয়া লড়াই হল। ১৯৭৩ সালে যুগোস্লাভিয়ার সারাজেভোয় ফাইনালে জিতেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। কলকাতা ও বার্মিংহামে জয় হল চীনের। পুরুষদের দলগত খেলা সোয়েথলিং কাপে গতবার রানার্স ছিল ড্রাগুটিন সুরবেক, অ্যান্তন স্টিপানসিচ, মিলিভোজ কারাকাসেভিক, মিরান সাভনিক, জোরান কোসানোভিককে নিয়ে গড়া যুগোস্লাভিয়া। এবার তারা চীন, জাপান, সুইডেন ও হাঙ্গেরির পরে স্থান পেয়েছে। কলকাতায় জাপানীরা হতাশ করেছিল, এবার তাঁরা বিভিন্ন বিভাগে দারুণ খেলেছেন। সারাজেভোয় যারা রানার্স হয়েছিল, সেই তাকাশিমা, হাসেগাওয়া, তাসাকা কোনোর মধ্যে হাসেগাওয়া বার্মিংহামে না খেললেও জাপান দুর্বল ছিল না। তবে, পুরনো ও প্রবীণদের নিয়েও জাপান এমন খেলবে—এটা ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। কেননা, এদের কেউ কেউ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যাচ্ছেন, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে। তাক লাগিয়েছেন মিৎসুরু কোনো। পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে তিনি এবার বিশ্ব চ্যাম্পিন হলেন। প্রথম এই খেতাবের জন্য ১৯৬৭-তে তোনো স্টকহোমে লড়ে রানার্স হন। ত্রিশের বেশি বয়স। তবুও টেবল টেনিসের দ্রুত লয়ের খেলা থেকে তাঁকে সরানো যায়নি। অথচ ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা ও'র চাইতে কম বয়সেও কেমন যেন ক্লান্ত। তাঁরা এশিয়ার খর্বকায়দের কাছে হতমান। যুগোস্লাভিয়ার তারকাদের মতই ১৯৭৩-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের স্টেল্যান, বেঙ্গটসন, জেল জোহানসন, ইংগেমার বিকস্টোম, বো পারসনরাও আর ভাল খেলতে পারছেন না। পিছিয়ে পড়েছেন চেকোস্লোভাকিয়ার মিলান অরলয়োস্কি, জিরি তুরাই শুভকারিকরাও।

পুরুষদের ব্যক্তিগত খেলায় এবার অঘটন একাধিক। গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরির ইস্তভান জনিয়র তৃতীয় রাউন্ডেই হারেন ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ন প্যাট্রিক বিরোশুর কাছে। জনিয়র ও তাঁর সতীর্থ টিবর ক্লাম্পর কলকাতায় ডাবলসেও চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এবার ডাবলসে এ'রা তৃতীয় রাউন্ডে হারেন চীনের লিয়াং হুয়াং ও য়ুয়ান শেং-লু জুড়ির কাছে। এবার পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল চীনাদেরই একচেটিয়া। লি চেন-শি ও লিয়াং কো-লিয়াং হারান ওদের দেশেরই লিয়াং হোয়াং ও লু য়ুয়াং-শেং-কে। মেয়েদের ডাবলসের ফইনালে উত্তর কোরিয়ার পার্কের জুড়ি ছিলেন চীনের ইং ইয়াং। তাঁরা হারান চীনের শিয়ান য়ুন-চু ও লি চে-ওয়েকে। চীন যথার্থই ব্যতিক্রম। পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনালে কোনোর কাছে পরাস্ত চীনের পয়লা নম্বর কু ইয়াও-হুয়ার নাম কখনও শোনা যায়নি। গতবার তিনি কলকাতায়ও আসেননি। একদম নতুন। গতবার চীনা কোচ কলকাতায় বলে-ছিলেন : লাখ লাখ ছেলেমেয়ে আমাদের দেশে টেবল টেনিস খেলে। তাই দশ-বারোজন নতুন খেলোয়াড় দিতে পারি প্রতিবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপসে। ওরা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক মানের। দেখছি কথাগুলো অসত্য নয়। আর ভারত? কলকাতায় আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা দলগত খেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে যায়। এবারও অবস্থা একই রকম। পুরুষরা গ্রুপ—২-এ হল তৃতীয়, মেয়েরা দ্বিতীয়। ব্যক্তিগত খেলায় তৃতীয় রাউন্ড অতিক্রম করতে পারেনি কেউ। ১৯৭৯ সালে প্রতিযোগিতা হবে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং শহরে। ভারত তখনও কি এমনই থাকবে?

বিশ্ব টেবল টেনিসে পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন

পার্ক ইয়ং সুন

গোপাল ভৌমিক / হাঁসের ছানা

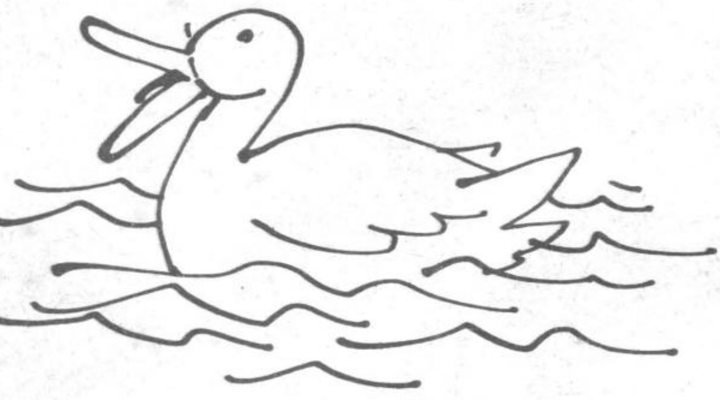

হাঁসের ছানা সাঁতার কাটে,
দেখছে খুকু পুকুর-ঘাটে!
প্যাঁকপেঁকিয়ে ডাকছে হাঁস,
ডুবলে হবে সর্বনাশ।
সাপখোপও তো জলে থাকে,
ভাবিয়ে তোলে তাইতো মাকে।

হঠাৎ জলে নামতে পেরে
হাঁসের ছানা চলছে তেড়ে।
ডুববে কিনা থাকবে ভেসে
দেখছে খুকু নির্নিমেষে।
প্যাঁকপেঁকিয়ে হাঁসও ছোটে
খাবার নিয়ে নিজের ঠোঁটে।
হাঁসের ছানা নির্বিকার,
দিচ্ছে কেমন ডুব সাঁতার!

ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

তোমরা প্রত্যেকেই জানো, ঠিকমত অভ্যাস করা না-থাকলে ম্যাজিক দেখানো মুশকিল। কারণ ম্যাজিকের মধ্যে কৌশলটাই একমাত্র বড় কথা নয়, তার থেকে আরও দরকারী হচ্ছে তার উপস্থাপন পদ্ধতি। ঠিকমত দেখাতে না-পারলে ম্যাজিকের কৌশল যত সুন্দরই হোক না কেন, কিছুতেই জমবে না। কিন্তু লেখাপড়া, খেলাধুলোর মাঝখানে ম্যাজিকের অভ্যাস করতে অনেকেই তোমরা সময় পাও না বলে আমায় জানিয়েছ। সেজন্য এবার ঠিক করেছি খুব কম অভ্যাসে দেখানো যায়, এমন একটা ম্যাজিক তোমাদের আমি শিখিয়ে দেব।

এই ম্যাজিকটা আসলে দুটো ম্যাজিকের সংমিশ্রণ। দুটোকে আলাদা আলাদা করেও দেখানো যায়, কিন্তু একসঙ্গে মিশিয়ে দেখালে খুব চমৎকার হয়। তোমরা ইচ্ছে করলে এগুলো অন্য ম্যাজিকের সঙ্গে মিশিয়ে দেখাতে পারো। সব কিছু নির্ভর করছে কী দেখাচ্ছ এবং কীভাবে দেখাচ্ছ তার ওপর। যাই হোক, প্রথম থেকেই শুরু করছি।

জাদুকর দর্শকদের সামনে একটা কাগজের মধ্যে ছক কেটে কতকগুলো নম্বর দেখিয়ে বললেন,—এই ছকে মোট ষোলটা ঘর আছে। লম্বালম্বিভাবে চারটে ঘর আর পাশাপাশি-ভাবেও চারটে ঘর এতে রয়েছে। এই ঘরগুলোর প্রত্যেকটাতেই কিছু কিছু নম্বর লেখা আছে। এবার তিনি একজন দর্শককে বললেন, ঐ ছকের লম্বালম্বি অথবা পাশাপাশি ঘরের যে কোনও একটা লাইন পছন্দ করতে এবং সেই লাইনের সব কটা নম্বর একটা কাগজে টুকে নিতে। কোন লাইন তিনি পছন্দ করলেন বা কী কী নম্বর তিনি লিখেছেন, তা যেন তিনি

96	11	89	68
88	69	91	16
61	86	18	99
19	98	66	81

গোপন রাখেন। দর্শক সেই নম্বরগুলো লেখবার পর জাদুকর বললেন, "ওগুলোকে যোগ করে কাগজটাকে ভালভাবে ভাঁজ করুন।" এরপর জাদুকর সেই কাগজটা নিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন। অর্থাৎ কোনওমতেই সেই নম্বর জাদুকরের জানা সম্ভব নয়। এবার ঐ পোড়া কাগজের ছাই জাদুকর হাতে নিয়ে তার বাঁ হাতের ওপর ঘষতে আরম্ভ করলেন। অবাক কাণ্ড। ঐ ছাইয়ের ঘষায় হাতের ওপর পরিষ্কার-ভাবে বড় বড় করে সেই যোগফলটা ফুটে উঠল। সংখ্যাগুলোর যোগফলটা জাদুকর জানতেন না। তবু সেটাকে পরিষ্কারভাবে তাঁর হাতে ফুটে উঠতে দেখে সবাই চমকে যাবেন।

এবার তোমাদের আমি কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি। আগেই বলেছি, খেলাটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে। প্রথমটা হচ্ছে—যোগফলটা জানতে পারা, এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে—সেটাকে হাতের ওপর ফুটিয়ে তোলা। খুব চমকপ্রদ হলেও অতি সহজ এর রহস্য। জাদুকর দর্শকদের যে নম্বরের ছকটা দিয়েছিলেন সেটা আসলে হচ্ছে একটা ম্যাজিক করা ছক। ওখানে নম্বরগুলো বেশ হিসাব করে সাজানো আছে। ছকটা আমি তোমাদের জন্য এঁকে দিলাম। খেয়াল করে দ্যাখো, এর পাশাপাশি এবং লম্বালম্বি যেভাবেই হোক না কেন, যে কোনও লাইন যোগ করলে যোগফল সব সময়েই ২৬৪ হচ্ছে। একবারের বেশী একই দর্শকের সামনে খেলাটা দেখিও না, মাত্র একবার দেখলে তাঁরা ঐ চালাকিটা বুঝতেই পারবেন না। তাঁরা ভাববেন যে, ইচ্ছেমতো নম্বর বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তার যোগফল জানা জাদুকরের পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এই তো গেল ম্যাজিকটার প্রথম পর্ব। অর্থাৎ, দর্শকদের বেছে নেওয়া সংখ্যাগুলোর যোগফল কত, তা তুমি আগের থেকেই জানতে পারলে। সেটা সবসময়েই দুশো চৌষট্টি।

এবার হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ। একটা সাবানের টুকরোকে ছুরি দিয়ে কেটে সরু করে নাও আর তারপর সেই সরু সাবান একটু জলে ভিজিয়ে বাঁ হাতের ওপর ভাল করে দুশো চৌষট্টি লেখ। খেয়াল রেখো, লেখাটা যেন থেবড়ে না যায়। সেজন্যই বলছি, সাবানটা সরু করে কেটে নাও। এবার ঐ সাবান হাতে শুকিয়ে গেলে খেয়াল করে দ্যাখো, সেখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে হাত একদম পরিষ্কার। কাগজের ছাই নিয়ে একটু ঘষলেই দেখবে—ঐ সাবান লাগানো অংশে কেমন কালো দাগ পড়েছে। তুমি নিজেই অবাক হয়ে যাবে। দর্শকেরা তো আর এই প্রস্তুতির কিছু জানবেন না, তাঁরা ভাববেন, ম্যাজিক করেই সংখ্যাটা হাতের ওপর লেখা হয়ে গেল।

আপনার চুল
সুন্দর সতেজ রাখতে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
৬০ বছরের ঐতিহ্য-সম্পন্ন আদি ও অকৃত্রিম
সুপ্রাচীন সূত্রের বহু পরীক্ষিত ল্যাকটোনের সাথে প্রাকৃতিক চন্দন তেল মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এই কেশ তেল—অপরিসীম যত্নে ও সতর্কতায়। একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার চুল যাতে সুন্দর ও সতেজ হয়ে বাড়তে পারে।
অনবদ্য এই কেশ তেলের
প্রস্তুতকারক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
BENGAL CHEMICAL
UNSCREW
CANTHARIDINE
A SUPERFINE HAIR TOILETRY
ভারতে
এই তেলের বিক্রয়
সর্বাধিক
ACIL/BC 5/76

মুখমণ্ডলের সুরক্ষার সংকল্প
কয়েক মাস ধরে দন্ত-ভক্ষক অম্ল (COOH*) মুখমণ্ডল আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছিলো। মুখমণ্ডল দেশের রাষ্ট্রীয় বিধান সভায় যুদ্ধের সামগ্রী বিদেশ থেকে নিয়ে আসার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো।
অল্প দিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি এক জাহাজ এসে ভিড়লো।
সৈন্যরা তাড়াতাড়ি দাঁতের কেল্লাকে মজবুত বানাতে লেগে গেলো…তার পর শুরু হলো পরীক্ষা ক'রে দেখার কাজ।
SUGARCANE
MILK
CARROT
APPLES
একদিন রাতে যখন সকলেই ঘুমিয়ে ছিলো তখন দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদল হঠাৎ ঢুকে হামলা করলো।
মুখমণ্ডলের বাসিন্দারা প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলো। কিন্তু তারা দন্ত-ভক্ষককে রুখতে পারলো না, কারণ সে আচমকা হামলা করার সুবিধা পেয়েছিলো।
একমাত্র আশা!
বিনাকা এফ-কে ডেকে পাঠাও!
তারপর…বিনাকা এফ তার অমোঘ অস্ত্র বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট সঙ্গে নিয়ে ধেয়ে এলো!
BF
Binaca
দন্ত-ভক্ষক একবার এর মোকাবিলা করোতো দেখি।
পিছু হটো, পালাও…পালাও
বিনাকা এফ আর মুখমণ্ডলের সৈন্যরা মিলিত হয়ে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের কচু-কাটা করলো।
ধন্য, ধন্য!
আমরা প্রাণে বাঁচলাম!
বিনাকা-এফ জিন্দাবাদ!
পুরণো অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট নয়। দাঁতের কেল্লাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে দিনে দু'বার বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে ব্রাশ করা একান্ত দরকার।
Binaca Fluoride
* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।
বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে — বিনাকা ফ্লোরাইড।